রাষ্ট্রীয় জীবনচরিতমালা

কাজী নজরুল ইসলাম

বসুধা চক্রবর্ত্তী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া
নয়া দিল্লী

মুখবন্ধ

প্রাচীনতম কাল থেকে আমাদের দেশে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটেছে। আমাদের ইতিহাসে এমন বহু লোকের নাম ভিড় করে আছে যাঁরা সাধারণের বাইরে—শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে, বিজ্ঞানে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁরা বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু নাম ঘরে ঘরে জানা। আর কিছু লোক আছেন যাঁদের নাম পরিচিত কিন্তু যাঁদের জীবন ও কীর্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের বিশেষ কিছু জানা নেই। তা'ছাড়া আরও কিছু লোক আছেন যাঁদের সম্বন্ধে লোকে খুব কম জানে অথচ তাঁরাও বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী।

যে কোনো দেশেব ইতিহাস সে দেশের মহৎ লোক ও মহিযসী নারীদের ইতিহাস তাঁরাই দেশকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন, গড়ে তুলেছেন। আমাদের দেশ কী ভাবে বিবর্তিত হয়ে এসেছে সাধারণ নাগরিকদের তা বুঝতে হলে ঐ সব ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কতকটা জানা অতীব প্রয়োজন।

এই উদ্দেশ্যে অনেক দেশই জাতীয় জীবনীকোষ প্রকাশ করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতে আমাদের সেরূপ সামগ্রিক কোনো গ্রন্থ নেই। এই যে জাতীয় জীবনীমালা প্রকাশিত হচ্ছে তা সে রকম বৈদগ্ধপূর্ণ ও সামগ্রিক বই প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে হচ্ছে না—এর উদ্দেশ্য বরং প্রাচীনতমকাল থেকে ভারতে যেসব বরেণ্য লোক ও মহিলা আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের জীবনী সরল ও কাহিনীর আকারে সাধারণ পাঠকের হাতে তু'লে দেওয়া। আলাদা আলাদা বইয়ে

জাতীয় জীবনীমালার এক জনপ্রিয় মহাকোষ গ'ড়ে তোলা আমাদের অভিপ্রেত।

বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের কালের এক অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তিনি এক অসাধারণ কবি ও দেশপ্রেমিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি প্রভূত দুঃখবরণ করেছেন। সে দুঃখসাধনা থেকে যে কবিতারাজির জন্ম হয়েছে তারা তাঁকে অমরত্ব দান ক'রেছে। যে সব ব্রতকে তিনি আপন ক'রে নিয়েছিলেন তাদেরও অমর ক'রে তুলেছে। শ্রী বসুধা চক্রবর্তী সহানুভূতি ও যথোচিত উপলব্ধি নিয়ে এ জীবনী লিখেছেন, এ জন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক কে, স্বামীনাথন্ ও শ্রী মহেন্দ্র ভি, দেশাই এই জীবনীমালার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন; আমি তাঁদের নিকটও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বি, ভি, কেশকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

জন্ম ও প্রথম জীবন

১৮৯৯ সালের ২৫শে মে, ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ এসেছিল কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম জন্মের শুভক্ষণ।

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রাম ; শোনা যায়, তাঁর পূর্বপুরুষগণ পাটনা থেকে সেখানে এসে বসবাস ক'রেছিলেন। মোগল আমলে তাঁরা ছিলেন কাজী অর্থাৎ বিচারক। "কাজী" পদবী তাই তাঁদের বংশপরম্পরাগত। মোগলরাজের নিকট থেকে তাঁরা জায়গীরও পেয়েছিলেন, কিন্তু নজরুলের পিতা ফকীর আহমদ সম্পদশালী লোক ছিলেন না। তিন বোন্ ও এক ভাইয়ের মধ্যে নজরুল ছিলেন দ্বিতীয়। শৈশবে তাঁকে ডাকা হ'তো দুখু মিঞা বলে, যেন তখন থেকেই আপন পরিবার পরিজন ও পারিপার্শ্বিকের দুঃখে তাঁর মন-প্রাণ হ'তো নিষিক্ত—বেদনাতে সঞ্জীবিত হয়ে সৃষ্টিতে উন্মুখ। পনেরো বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন ; দুঃখে কষ্টে কেটেছিল তাঁর বাল্যজীবন। গ্রামের মক্তব থেকে তিনি নিম্ন প্রাইমারী পরীক্ষা পাশ ক'রেছিলেন, কিছুদিন সেখানে শিক্ষকতাও করেন। তখন তাঁর স্কুলে ভর্তি হওয়া হয়ে ওঠেনি। গ্রামের লেটো দলের জন্য গান রচনা করা, রেলওয়ের এক গার্ডের বাসাতে গৃহভৃত্যের কাজ এবং রুটির দোকানে চাকুরী—এ সব করেই তাঁর দিন কাটছিল। সংকেতের সাহায্যে কোরাণ পড়ার যে পদ্ধতি আছে তাইতে তিনি কোরাণ পড়া শিখেছিলেন আর অল্প অল্প ফার্সী শিখেছিলেন কাজী বজ্‌লে করিমের নিকট ; বজ্‌লে করিম সম্পর্কে তাঁর চাচা হ'তেন। কিন্তু কাব্য ও সংগীত রচনায় তাঁর কৃতিত্ব তখন থেকেই। গ্রাম্য দলের জন্য তিনি গান, নাটক-নাটিকা রচনা করতেন, নিজেও ঢোল বাজাতে

শিখেছিলেন। এ সব দেখে শুনে কাজী রফীউল্লা নামে এক পুলিশ কর্মচারী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর বাড়ী ছিল অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলায়। নজরুলকে তিনি সেখানে নিয়ে গিয়ে দরিরামপুর গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। সে স্কুলের এখন নাম হয়েছে নজরুল একাডেমী। নজরুল কিন্তু সে স্কুলে বেশীদিন ছিলেন না। তিনি বর্ধমানে ফিরে এসে মাথরুণ গ্রামে নবীনচন্দ্র ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হন। কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক তাঁর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন। কিছুদিন পব তিনি শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে ভর্তি হন, স্কুলে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ পান ও স্থানীয় জমিদার পরিবারের আনুকূল্যে স্কুলের মুসলমান হোষ্টেলে বিনাব্যয়ে থাকতেও পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে মাসিক সাত টাকা ভাতাও দিতেন। তিনি ছিলেন ক্লাসের সেরা ছাত্র, অষ্টম শ্রেণী থেকে ডবল প্রমোশন পেয়ে দশম শ্রেণীতে ওঠেন। এই স্কুলেই তিনি শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের সংস্পর্শে আসেন। নিবারণচন্দ্র ঘটক ছিলেন বিপ্লবী যুগান্তর পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তার কাকীমা দুকুড়িবালা দেবী বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে প্রথম অস্ত্র আইনে জেল খেটে ছিলেন। নজরুল নিজেই বলেছেন যে নিবারণচন্দ্র তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁরই প্রভাবে তিনি বাঙ্গালী ডবল কোম্পানীতে নাম লেখান—পরে ঐ কোম্পানীরই নাম হয়েছিল ৪৯নং বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট। এই রেজিমেণ্ট প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে গঠিত হয়েছিল। জনসাধারণের পক্ষ থেকে বাঙ্গালী যুবকদের সামরিক শিক্ষাদানের দাবী ওঠার ফলে এর পত্তন হয়। এর ঘাটি ছিল করাচীতে। নজরুলের তাতে ভর্তি হবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই যে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ

করলে পর একদিন স্বদেশের মুক্তি সাধনায় তা কাজে লাগবে। নজরুল ছিলেন ক্লাসের সেরা ছাত্র; পড়াশোনা বন্ধ করবার কোনো কারণই তাঁর ছিলনা, একমাত্র স্বদেশ-প্রেমই তাঁকে অন্য পথে পরিচালিত করলো। বয়স তাঁর তখন মাত্র আঠারো। এই সময় থেকেই তাঁর জীবনপথ ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কারণে অন্য মোড় নিলো। দেশ ও কালের সঙ্গে তখন তাঁর মোকাবিলা শুরু: সে দেশকালের পরিচয় এখন একটু স্মরণ করা প্রয়োজন।

অনেক সংস্কৃতির ধারা মিশেছে এই বাংলা দেশে: গানে, কাব্যে, লোকগীতিতে তাদের প্রকাশ ঘটেছে। তাদের পারস্পরিক সমন্বয় হয়েছে কিনা সে বিচার পণ্ডিতেরা করবেন। ইতিহাসের বিচিত্র ধারায় বিকশিত হয়েছে তারা। কেউ কেউ বলেন, প্রাচীন সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গেই অনেকটা আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল; পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন ধর্মপ্লাবনে তার মধ্যে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটেছে; ফলে তার রূপও হয়েছে বিচিত্র। এ মত কতটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সে সূক্ষ্ম আলোচনা ছেড়ে দিলেও অবিসংবাদিত সত্য যে বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে তারা পাশাপাশি প্রবহমান রয়েছে। প্রকাশ তার শ্যামা-সংগীতে, পদাবলী কীর্তনে, বাউল ভাওয়াইয়া গানে, ঝুমুরে, মুর্শিদাতে, পূর্ববঙ্গের মাঝির সারিগানে, ভাটিয়ালে। যুগ যুগ ধরে রাধাকৃষ্ণ প্রেমে রসের অনন্ত প্রস্রবনা—বাঙালীর মন হয়েছে ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ। শক্তির সাধনাও সে করতে চেয়েছে; ভাব-সংঘাত ঘটেনি এমন নয়, ভাবালুতাও এসেছে—তাকে করেছে কখনো কর্মে বেপরোয়া, কখনো বা বিভ্রান্ত। উনবিংশ শতাব্দীতে লাগলো তাতে প্রতীচ্যের সংস্পর্শ। তার ফলে এলো যে ভাবের বন্যা, ডিরোজিওর নেতৃত্বে তা প্রাচীন সমাজকে

চঞ্চল ক'রে তুললো। প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে যা ছিল যুক্তি-ভিত্তিক রাজা রামমোহন রায় তাকে তার সঙ্গে যুক্ত করে আত্মস্থ করবার চেষ্টা করলেন। তার ফলে সংস্কৃতির যে স্ফুরণ ঘটলো তাকে বাংলার রেণেসাঁস বলা হয়ে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দুঃসাহসিক সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টা তারই অন্যতম প্রকাশ। রামকৃষ্ণ পরমহংস যে মত সমন্বয়ের দিগনির্দেশ দিয়েছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বর সেবাকে জীব প্রেমের রূপ দিয়ে তাকে এক সক্রিয় সমাজ দর্শনে রূপান্তরিত করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জাগলো দেশে রাষ্ট্রীয় চেতনা—তারও পিছনে ছিল কতকটা পাশ্চাত্যের প্রভাব। ইতালীর ম্যাটসিনি, গারিবল্‌দি'র শৌর্যবীর্যের কাহিনীও বাঙ্গালীর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করলেন "আনন্দমঠ", দেশকে দিলেন "বন্দেমাতরম"য়ের সঞ্জীবনী মন্ত্র। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় চেতনা আহত হলো বঙ্গভঙ্গে : দুরন্ত প্রতিরোধ স্বাধীনতা সংগ্রামের নিশানা রচনা করলো। অহিংসার বাঁধন তার ছিলনা। বঙ্গভঙ্গ রহিত হলো। প্রথম মহাযুদ্ধে বাঙ্গালীর সামরিক শিক্ষার যে সীমিত সুযোগ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট করে দিতে বাধ্য হলো, তাই টেনে নিয়ে গেলো নজরুল ইসলামকে। হাবিলদাররূপে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের এই ছিল ঐতিহাসিক পটভূমি।

তবু নজরুল মূলত কবি। তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৩২৫ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য়। করাচী থেকেই তিনি কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন। পত্রিকাটি ছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মুখপত্র। মুসলমান লেখকগণ এই সমিতি গঠন ক'রেছিলেন। তার

কারণস্বরূপ তাঁরা বলতেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাঁদের কাজের যথেষ্ট সুযোগ মিলতোনা—যদিও তাঁরা পরিষদেরও সদস্য ছিলেন। প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা মিঃ মুজফফর আহমদ ছিলেন সে সময়ে সমিতির সহকারী সম্পাদক। পত্রিকা প্রকাশ সম্পর্কিত সব কাজ তাঁকেই করতে হতো। "কাজী নজরুল ইসলাম ঃ স্মৃতিকথা" নামক বইয়ে তিনি বলেছেন যে নজরুল কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন "ক্ষমা", কিন্তু সম্পাদকেরা নাম পরিবর্তন ক'রে রাখেন "মুক্তি"। নজরুলও মুজফফর সাহেবের নিকট এক চিঠিতে ঐ পরিবর্তন অনুমোদন করেন। কবিতাটি এক সত্য ঘটনা নিয়ে লেখা। প্রথম কয়েক লাইন এই—

"রাণীগঞ্জের অর্জুন পটির বাঁকে,—
যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বৌ কলস কাঁখে
সেই সে বাঁকের শেষে
তিন দিক হতে তিনটে রাস্তা এসে
তেপথার সেই 'দেখাশুনা' স্থলে
বিরাট একটা নিম্ব গাছের তলে,
জটওয়ালা সে সন্ন্যাসীদের জটলা বাঁধত সেথা
গাঁজার ধুঁয়ায় পথের লোকের আঁতে হোত বেথা"

সেখানে হঠাৎ একদিন এক ফকীরকে দেখা গেলো, তাঁর পা ছিল শেকলে বাঁধা। কিন্তু এক অসাধারণ উপায়ে তিনি ভববন্ধন থেকে মুক্তি অর্জন করলেন এবং তাকেই মুক্তির আনন্দ বলে মেনে নিলেন। অনেকে এই কবিতার অর্থ করেছেন এই বলে যে বাল্যকাল থেকেই নজরুলের

অধ্যাত্মিকতার দিকে ঝোঁক ছিল। বস্তুত এও সত্য যে তিনি তারও আগে হাজী সাহালওয়ান নামে এক ফকীরের মাজার নিয়মিতভাবে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার রাখতেন এবং সন্ধ্যাবেলায় সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতেন। সাধুসন্ন্যাসীদের গাঁজা সেবন করানোও নাকি তাঁর প্রিয় কাজ ছিল। কাজেই আধ্যাত্মিক ব্যাপারে তাঁর আকর্ষণ ছিল বললে ভুল বলা হবে না। কালক্রমে তাই যোগের প্রতি আকর্ষণে পরিণত হয় এবং তিনি যোগ শিক্ষাও করেন। "মুক্তি" কবিতার পর বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর কয়েকটি গল্প, তাদের মধ্যে "ব্যথার দান" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই একান্ত হৃদয়গ্রাহী গল্পটি একাধারে নজরুলের আন্তর্জাতিকতা ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমের পরিচয় বহন করছে। গল্পটিতে বলা আছে যে তার নায়কেরা লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিল। কিছু ভারতীয় সৈন্য ও রাজনৈতিক কর্মী সে সময়ে প্রকৃতই লাল ফৌজে যোগ দিয়েছিল, মুজফফর সাহেবের মতে সে ঘটনা উপলক্ষ করেই ওরকম বলা হয়েছে। সে যা-ই হোক্, তাদের জীবন ও কর্মের প্রধান উৎস ছিল স্বদেশপ্রেম। ১৯২০ সালের প্রথম ভাগে নজরুল সাত দিনের ছুটি পেয়ে কল্‌কাতা আসেন এবং বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার কার্য্যালয়ে যান। "সওগাত" পত্রিকাতেও ঐ সময়ে তাঁর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন ছিলেন তার সম্পাদক। আর ৺ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত "প্রবাসী"তে প্রকাশিত হয় শেখ হাফিজের কবিতার কয়েক লাইনের বঙ্গানুবাদ। নজরুল ইতিমধ্যে ফার্সী ভাষাটাই শিখেছিলেন। হাফিজ নূরন্নবী ছিলেন শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে তাঁর শিক্ষক; নজরুল তাঁর

নিকট এবং তারপর নিজের রেজিমেণ্টের সঙ্গে যুক্ত এক মৌলভীর নিকট ফার্সী শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন। তার ফলে পরবর্তীকালে তিনি ফার্সী থেকে বহু অনুবাদ করতে সক্ষম হন।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৪৯নং বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়া হয়, নজরুল কল্‌কাতায় ফিরে আসেন। প্রথমে তিনি বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখার্জ্জীর নিকট উঠেছিলেন; কথাশিল্পী হিসেবে শৈলজানন্দের কৃতিত্বের সূচনাও সে সময়েই হয়েছিল। তারপর তিনি চলে যান্‌ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার অফিসে, মুজফফর সাহেবও তখন সেখানেই থাকতেন। প্রাক্তন সৈনিক হিসেবে নজরুলের সরকারী চাকরী পাবার খুব সম্ভাবনা ছিল; সাব-রেজিষ্ট্রার পদের জন্য তিনি আবেদনও করেছিলেন এবং ইণ্টারভিউতে আহুতও হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বোঝালেন যে তাঁর মধ্যে উজ্জ্বল সাহিত্যিক সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার স্ফুরণের জন্য তাঁর কল্‌কাতায় থাকা দরকার। নজরুল সরকারী চাকরীতে গেলেন না, তাঁর জীবনের এক মহৎ সার্থকতার অধ্যায় শুরু হ'লো। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর; উষার আলোকে ধ্বনিত হলো—

মধ্যাহ্নের "প্রদীপ্ত আহ্বান
জয় অভিনব যৌবন-অভিযান"।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবি বিদ্রোহীর আবির্ভাব

হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের লেখনী এবার দ্রুত-বেগে চল্‌তে লাগ্‌লো। কবিতা, গান, গাথা, গল্প, রম্যরচনা সৃষ্টিতে বিরাম রইলো না। অনেক পত্রিকায়ই তিনি এ সময়ে লিখতেন তবে বিশেষ ক'রে লিখতেন "মোসলেম ভারত" নামক পত্রিকায়। মুসলমান লেখকেরা এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন, প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে। পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন কবি মোজাম্মেল হক; নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ছিল তাঁর নিবাস। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর পুত্র আফজালুল হকই পত্রিকাটি চালাতেন। আফজালুল হক কলকাতা কলেজ স্কোয়ারের পূবদিকে অবস্থিত মোসলেম পাবলিশিং হাউসেরও মালিক ছিলেন। "মোসলেম ভারত"য়ে নজরুলের যে রচনা প্রথম প্রকাশিত হয় তার নাম ছিল "বাঁধনহারা": পত্রাকারে লিখিত উপন্যাস। তাঁর বহু কবিতা "মোসলেম ভারত"য়ে ছাপা হয়: যথা "শাত্‌-ইল্‌ আরব":

"শাতিল আরব! শাতিল আরব! পূত যুগে যুগে তোমার তীর, শহীদের লোহু, দিলীরের খুন ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।"

শেষ স্তবক এরূপ:

> "ইরাক-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,—
> কে জানিত কবে বঙ্গ বাহিনী
> তোমারও দুঃখে 'জননী আমার' বলিয়া
> ফেলিবে তপ্ত নীর!

রক্ত-ক্ষীর—
পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত ঢালিল দু'ফোঁটা ভক্তবীর।
শহীদের দেশ! বিদায়! বিদায়!! এ অভাগা আজ
নোয়ায় শির!"

আর ছাপা হয় "মোহর্‌রম", "কোরবাণী" "ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম", "বাদল প্রাতের শরাব", "বাদল বরিষণ" নামে এক রূপক গল্প।

নজরুলের আরও অনেক কবিতা ও গান ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "খেয়া পারের তরণী"। জানা যায়, ঢাকার ক'নো এক অভিজাত পরিবারের বেগম সাহেবার আঁকা একখানা ছবি এই কবিতা রচনার প্রেরণা যুগিয়েছিল। কবিতাটির শেষ স্তবক :

'শাফায়ত'-পাল-বাঁধা তরণীর মাস্তুল,
'জান্নত' হ'তে ফেলে হুরী রাশ্ রাশ্ ফুল।
শিরে নত স্নেহ-আঁখি মঙ্গল-দাত্রী,
গাও জোরে সারি-গান ওপারের যাত্রী!
বৃথা ত্রাসে প্রলয়ের সিন্ধু ও দেয়া-ভার,
ঐ হল পুণ্যের যাত্রীরা খেয়া পার।"

"উপাসনা" ও "সওগাত" কাগজেও নজরুল সে সময়ে লিখতেন। কিন্তু এই সময়েই তিনি সাংবাদিকতায় যোগ দেন পুরোপুরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই তিনি স্কুল ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন; একই উদ্দেশ্যে মূলত কবি হয়েও সাংবাদিকতা অবলম্বন করেন। এতে তাঁর মনের ও জীবনের এক বিশিষ্ট দিক স্বমহিমাতে প্রকাশ পেলো। স্বদেশের পরাধীনতা তাঁর মর্মে মর্মে জ্বালা ধরাতো, স্বদেশের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তাঁর

অন্য সব বাসনা-কামনাকে ছাপিয়ে উঠেছিলো। ছন্দের ও সুরের যাদুকর তিনি, কিন্তু স্বদেশানুরক্তি তাঁর এত গভীর যে রাজনীতি থেকে দূরে থাকবার উন্নাসিকতা কখনও তাঁর মনে আসতো না। বরং, কাব্য, গান, কথা তাঁর স্বদেশ মুক্তি সাধনার অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। ১৯২০ সালে প্রথম তিনি সাংবাদিকরূপে যোগ দেন। ভারতের ইতিহাসে সে এক ক্রান্তিকাল। ১৯১৯ সালে অমৃতসরের জালিওয়ানওয়ালা বাগে বৃটিশ সেনাপতি নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত করে, সারা পাঞ্জাব সাম্রাজ্যবাদী নৃশংসতায় বেদনায় গুমরে ওঠে। প্রথম মহাযুদ্ধে বিজয়ী মিত্রসেনারা তুরস্ককে নির্বীর্য, হীনবল করার ব্যবস্থা করে; তুরস্কের বাদশাহ ছিলেন খলিফারূপে দুনিয়ার মুসলমান সমাজের ভক্তির পাত্র: তাঁর সে মর্যাদাও চলে যায়, ফলে ভারতের মুসলমান সমাজেও তীব্র বিক্ষোভ জাগে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯১৭ সালে কথা দিয়েছিলেন যে যুদ্ধের শেষে ভারতের স্বায়ত্ত শাসনাধিকারের দাবী মেনে নেবেন। ১৯১৯ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার নামে যে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, জাতীয়তাবাদী ভারত ও জাতীয় কংগ্রেস তা' একান্ত যথেষ্ট নয় ও নৈরাশ্যজনক বলে প্রত্যাখ্যান করেন। এই পুঞ্জীভূত অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধী অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তন করলেন। জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অধিবেশনে আন্দোলন অনুমোদিত হয়; সারা দেশ অভিনব প্রত্যাশায় চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। এসময়েই মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক্ "নবযুগ" নামে সান্ধ্য পত্রিকা প্রকাশ করেন। মৌলভী ফজলুল হক ছিলেন মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী; তবে আবেগ-প্রবণতার দরুণ তাঁর সব সময়ে স্থৈর্য বজায় থাক্‌তো না,

পরে কোনো কোনো সময়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। মুজফ্ফর আহ্মদ সাহেব দাবী করেন যে তাঁরই পরামর্শে হক সাহেব পত্রিকা প্রকাশ ক'রেছিলেন এবং পত্রিকা প্রকাশের যা' কিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তা'ও তাঁর দ্বারাই হয়েছিল। ঐ পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব ছিল প্রধানত কাজী নজরুল ইসলামের। তাঁর লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ একত্র সংকলিত করে—"যুগবাণী" নাম দিয়ে বই প্রকাশিত হয়, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সঙ্গে সঙ্গেই সে বই বাজেয়াপ্ত করে নেন্। এই সব প্রবন্ধে ছিল রাজনৈতিক সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। তা'ছাড়া ইতিমধ্যে শ্রমিক কৃষকদের দাবীদাওয়ার আন্দোলনও শুরু হয়ে গিয়েছিল; নজরুলের প্রবন্ধে সে সবও প্রতিফলিত হতো। তদানীন্তন বৃটিশ সরকার বহুবার "নবযুগ"কে সাবধান করে দেন; তারপর কাগজের মুদ্রাকর যে এক হাজার টাকার সিকিউরিটী জমা দিয়েছিলেন, তা' বাজেয়াপ্ত করেন। কাগজ চালানো কঠিন হয়ে পড়ে, আবার দু'হাজার টাকা জামানত দিতে হয়। হক সাহেবের কয়েকজন রাজনৈতিক বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দেন কাগজের সুর নরম করে ফেল্তে। এর ফলে নজরুল কাগজ ছেড়ে চ'লে যান, কিছুদিন পর মুজফ্ফর সাহেবও কাগজের সংশ্রব ত্যাগ করেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে 'নবযুগ'য়ের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্কচ্যুতি ঘটে। নজরুল এরপর বিশ্রামের জন্য দেওঘর গিয়েছিলেন।

"নবযুগ"য়ে কাজ করবার সময়ে নজরুলকে বহু রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখ্তে হতো, কিন্তু তাঁর কবিতা রচনারও বিরাম ছিল না। তুরস্কের নবজাগরণের উদ্গাতা মুস্তাফা কামাল পাশার নামে—"কামাল পাশা" নামক তাঁর বিখ্যাত কবিতা ঐসময়েই রচিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর দেশে

দেশে যে নবজাগরণের জোয়ার ব'য়েছিলো তা' কবি নজরুলকে বহু কবিতা রচনার প্রেরণা দান করে। স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সর্দার আবদুল করিমের উদ্দেশে রচিত কবিতা তাদের অন্যতম। কাব্যের ও কাজের এই উত্তাল স্ফুরণের বেলায় তাঁর বন্ধুমণ্ডলীও বিস্তার লাভ করে। তাঁর সমবয়সী এবং কোনো কোনো জ্যেষ্ঠ কবি ও লেখকদের সঙ্গেও তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। প্রখ্যাত কবিও প্রবন্ধ লেখক মোহিতলাল মজুমদার ঐসময়ে নজরুলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন; কিন্তু কিছুদিন পর দেখা যায়, তিনি নজরুলের উপর বীতরাগ হয়ে পড়েছেন এবং তীব্র শ্লেষপূর্ণ কবিতায় তাঁকে আক্রমণ করছেন। নজরুল কিন্তু ঐ প্রকার ব্যবহারে বিচলিত হ'তেন না, সমসাময়িক লেখকদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার সর্বদাই হৃদ্যতাপূর্ণ ছিল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও ছিলেন বয়সে তাঁর বড়ো, নজরুল তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তাঁর উদ্দেশে কবিতাও লিখেছিলেনঃ তাঁর অকাল মৃত্যুতে লিখলেন "সত্যেন্দ্র প্রয়াণ গীতি"। মতান্তর বা মনান্তর ঘটলেও নজরুলের মনে কারু প্রতি দ্বেষ বা সদিচ্ছার অভাব ঠাঁই পেতোনা, এ'সত্য সবাই স্বীকার করেছেন। তাই সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল বিপুল।

দেওঘর থেকে ফিরে নজরুল পুনরায় অল্প কিছুদিন 'নবযুগ'য়ে কাজ ক'রেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কাগজের নীতি পরিবর্তনের ফলে জনপ্রিয়তাও ক'মে গিয়েছিল, গভর্ণমেণ্ট নজরুলকে সরিয়ে দেবার জন্য চাপও দিচ্ছিলেন। এই সময়েই নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ঘটে। তাঁকে এক বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত করানো হয়। পরে দেখা যায়, সে এক প্রবঞ্চনার ব্যাপার। এ'তে তাঁর মনে খুব

আঘাত লাগে; কিন্তু তার পরই ধারাবরিষণের মতো তাঁর কলম থেকে কবিতা ঝ'রে পড়তে থাকে। স্বদেশের মুক্তিসাধনায় তখন তাঁর মনপ্রাণ উদ্দীপ্ত। অসহযোগ আন্দোলন চলছে—মহাত্মা গান্ধীর যুগান্তকারী আবির্ভাবকে লক্ষ্য করে নজরুল লিখলেন:

"এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায়
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।
অধীন দেশের বাঁধণ বেদন
কে এলোরে কর্‌তে ছেদন?
শিকল দেবীর বেদীর বুকে মুক্তিশঙ্খ কে বাজায়।

মরা মায়ের লাশ কাঁধে ঐ অভিমানী ভা'য়ে ভা'য়ে
বুক ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আন্‌ল মরণ-পারের মায়ে।
পণ করেছে এবার সবাই
পর দ্বারে আর যাবনা ভাই!
মুক্তি সে ত নিজের প্রাণে, নাই ভিখারীর প্রার্থনায়॥

শাশ্বত যে সত্য তার ভুবন ভরে বাজলো ভেরী,
অসত্য আজ নিজের বিষেই মর্‌ল, ও তার নাইকো দেরী।
হিংসুকে নয়, মানুষ হয়ে,
আয়রে, সময় যে যায় বয়ে!
মরার মতন মরতে ওরে মরণ-ভীতু ক'জন পায়॥

ইস্‌রাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে নিশান বিষাণ সাথে,
প্রলয় রাগে নয়রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে!
পথের বাধা স্নেহের মায়ায়
পায় দলে আয় পায় দলে আয়।
রোদন কিসের?—আজ যে বোধন!
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয়রে আয়॥"

এরূপ অনেক কবিতা ও গান তাঁর হাত দিয়ে বেরুলো "মরণ-বরণ" কবিতাটি বিশেষ ক'রে জনসাধারণকে আকৃষ্ট ক'রেছিলো :

"এস এস এস ওগো মরণ !
এই মরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় করগো হরণ ॥
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাদের বুকের 'পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙ্গন-ভরা চরণ ॥
দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশী,
মরার মুখেও আগুন উঠুক হাসি !
কাঁধে পিঠে কাঁদে যথা শিকল জুতোর ছাপ
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ !
সে দেশের বুকে শ্মশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সেথা জাগুক নবীন সৃষ্টি আবার হোক্ নব নাম করণ ॥
হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে—
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে,
শব ক'রে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছো ॥
মরায়—ভরা ধরায়, মার ! তুমি শুধু বাঁচো—
এই শেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ ॥
জ্ঞান বুড়ো ঐ বলছে জীবন মায়া,
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া !
মুক্তিদাতা মরণ ! এসে কাল বোশেখীর বেশে,
মরার আগেই মরলো যারা নাও তাদের এসে,
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা মরার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগ্‌ছে তোমার মরণ হরণ শর ॥"

আর একটি কবিতার মর্মকথা :

"বল্, নাহি ভয়, নাহি ভয় !
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয় !
বল্ হউক গান্ধী বন্দী, মোদের সত্য বন্দী নয় !
বল্, মাভৈঃ মাভৈঃ, পুরুষোত্তম জয় !"

হাজার হাজার লোক কারাগার বরণ করছে—সে এক অপূর্ব ব্যাপার। নজরুল "বন্দী বন্দনা" আরম্ভ করলেন এই বলে :

"আজি রক্ত-নিশি-ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয়—বাধা স্বাধীন হিয়া তলে ॥"

সমস্ত কবিতাটিতে যেন স্বদেশের মুক্তি অভিমুখে বন্দীদের যাত্রা অনুরণিত হয়ে উঠেছে। ভাবের প্লাবন এসেছে দেশে, বিচিত্র সুরে-ছন্দে নজরুল তাতে সাড়া দিয়েছেন। "চরকার গান" এমনি এক কবিতা। প্রথম স্তবকটি এই :

"ঘোর—
ঘোর্‌রে ঘোর্ ঘোর্‌রে আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥
তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সবাই শুন্‌তে যেন পাই
ঐ খুল্‌ল স্বরাজ সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘুরে আস্‌ল ভারত-ভাগ্য রবি, কাটল দুখের রাতি ঘোর ॥"

কিন্তু দেশ যে তখন শুধু আদর্শবাদিতায় পূর্ণ, তা' নয়। সমাজে ছিল বিস্তর প্রবঞ্চনা, কুসংস্কার, নজরুলের ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতার আওতায়ও এসেছিল। সে সবের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী গর্জে উঠলো। এক বিয়েবাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে তাঁকে হতে হয়েছিল সাম্প্রদায়িক ঘৃণার শিকার, তখনই লিখলেন তিনি "জাতের বজ্জাতি।" কবিতাটির শুরু এরূপ :

"জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিযাত খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া।
হুকোঁর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই
জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ' খান!
এখন দেখিস্ ভারত-জোড়া
পচে' আছিস বাসি মরা,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত—শেয়ালের হুক্কাহুয়া॥"

লেখার ফলও ফল্‌লো, অপরাধীরা ক্ষমা চেয়ে পরিত্রান পেলো।

"সত্য-মন্ত্র" নামে আরেকটি কবিতাও ঐ সময়ে লেখা। তাব আরম্ভ এরূপ :

"পুঁথির বিধান যাক্ পুড়ে' তোর,
বিধির বিধান সত্য হোক
বিধির বিধান সত্য হোক!!
(এই) খোদার উপর খোদকারী তোর
মান্‌বেনা আর সর্বলোক
মান্‌বেনা আর সর্বলোক!!"

আর শেষ হয়েছে এই ব'লে :

"চিনেছিলেন খৃষ্ট বুদ্ধ
কৃষ্ণ মোহম্মদ ও রাম…
মানুষ কী আর কী তার দাম।
(তাই) মানুষ তাদের কর্‌ত ঘৃণা,
তাদের বুকে দিলেন স্থান,
গান্ধী আবার গান সে গান।
(তোরা) মানব শত্রু, তোদেরই হায়
ফুটলনা সেই জ্ঞানের চোখ।
বিধির বিধান সত্য হোক্‌ !
বিধির বিধান সত্য হোক্‌ !!"

এ'সব কবিতা, "ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম" নামে এক দীর্ঘ ধর্মকাব্য ও "ঝড়" নামে এক দীর্ঘ কবিতা নিয়ে "বিষের বাঁশী" নামে বই প্রকাশিত হয়, কিন্তু সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে নেন। নজরুল ঐ সময়ে অন্য ধরণের কবিতাও লিখেছিলেন—ঘনিষ্ঠ কারু কারু উদ্দেশে লিখিত কয়েকটি মধুময় কবিতাও তারমধ্যে ছিল।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ইতিমধ্যে কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। বাংলা দৈনিক "বাংলার কথা" তাদের অন্যতম। শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর অনুরোধক্রমে নজরুল "ভাঙ্গার গান" নামে গীতি কবিতা লেখেন :

"কারার ঐ লৌহ কবাট
ভেঙ্গে ফেল, কররে লোপাট
রক্তজমাট
শিকল—পুজোর পাষাণ-বেদী !
ওরে ও তরুণ দিশান !

বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি !

(২)

গাজনের বাজনা বাজা
কে মালিক ? কে সে রাজা ?
কে দ্যায় সাজা
মুক্ত স্বাধীন সত্যকে রে ?
হা হা হা পায় যে হাসি
ভগবান পর্‌বে ফাঁসি ?
সর্বনাশী
শিখায় এ হীন তথ্য কেরে ?

(৩)

ওরে ও পাগল—ভোলা
দে রে দে প্রলয়—দোলা
গারদগুলা
জোরছে ধরে হেঁচকা টানে !
মার হাঁক হৈদরী হাঁক,
কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক,
ডাক্ ওরে ডাক্
মৃত্যুকে ডাক্ জীবন পানে !

(৪)

নাচে ঐ কাল-বোশেখী
কাটাবি কাল বসে কি ?
দেরে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি !

লাথি মার্, ভাঙরে তালা।
যত সব বন্দীশালায়
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল্ উপাড়ি !”

এই কবিতাটি ছিল “ভাঙ্গার গান” নামক বইয়ের প্রথম কবিতা, বইটি প্রকাশ হওয়া মাত্র বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু নজরুলের কাব্য প্রবাহ তাতে স্তব্ধ হয়নি।

১৯২১ সালের শীতকালে রচিত হয় নজরুল ইসলামের দীর্ঘ ও যুগান্তকারী কবিতা “বিদ্রোহী”। বাঙ্গালীর সাহিত্যে ও জীবনে কবিতাটি তীব্র উন্মাদনা সৃষ্টি ক'রলো। এই কবিতা নজরুল ইসলামের স্থান, কাব্য ও সাহিত্যের পুরোভাগে নির্দিষ্ট করে দিলে। “বিদ্রোহী” “মোসলেম ভারত”য়ে প্রকাশার্থে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অগ্নিঋষি বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তখন “বিজলী” নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করতেন। “বিজলী”ও “বিদ্রোহী” কবিতার একখানা কপি পেয়েছিল; “মোসলেম ভারত” প্রকাশে বিলম্ব হওয়াতে কবিতাটি “বিজলী”তেই আগে ছাপা হয়। কবিতাটি বাংলা দেশে অভূতপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কিন্তু দু'এক জন এতে বেজারও হন। মোহিতলাল মজুমদার ইতিপূর্বে “আমি” নাম দিয়ে স্বগতোক্তির ছাঁচে এক নিবন্ধ লিখেছিলেন—তিনি দাবী করেন, “বিদ্রোহী” “আমি” বই অনুকরণে লিখিত হ'য়েছে। কিন্তু সমসাময়িক সাহিত্য জগৎ এ দাবী মেনে নেননি। মোহিতলালের প্রভাব নজরুলের উপর পড়ে থাকতে পারে, মোহিতলালের শেষ দিকের কোনো কোনো কবিতায় নজরুলের প্রভাবও কোনো কোনো সমালোচক লক্ষ্য করেছেন। নিগূঢ় সে প্রভাব, স্বতঃপ্রণোদিত ভাববিনিময়ের অন্তর্গত—তাকে অনুকরণ বলা চলে না।

কিন্তু সাপ্তাহিক "শনিবারের চিঠি" নজরুলের কবিতা ও গানের ব্যঙ্গানুকরণ প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন, পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় নজরুলের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণও কম হয়নি। সম্পাদক সজনীকান্ত দাস নিজেও ছিলেন কৃতী কবি ও সাহিত্যিক, পরে তিনি নজরুলের সঙ্গে বন্ধুত্বও দাবী করেছিলেন। ঐ ধরণের সমালোচনা সত্তেও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সে সময়েই নজরুলকে সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বাগত জানান।

কিন্তু তখনও তাঁর লক্ষ্য অবিচল, স্বদেশে তিনি নিবেদিত-প্রাণ, রাজনীতিতে তাঁর অপার আগ্রহ, সাংবাদিকতায় তাঁর মন পড়ে আছে। মুজফফর আহমদ সাহেব ঐ সময়ে একটা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করবার চেষ্টা করছিলেন, নজরুল তাঁর সহায় হলেন। সে সময়েই কলকাতা থেকে মওলানা আবুল কালাম আজাদের বিখ্যাত উর্দু কাগজ "আল হিলাল" ও "আল বালাগ" প্রকাশিত হতো। মিঃ কুতব্উদ্দীন আহ্মদ নামে একজন সমাজকর্মী ছিলেন কাগজ দুটির ম্যানেজার। তিনি মুজফফর সাহেবদের উদ্যোগে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু তাঁর পরামর্শ ছিল এই যে প্রথমেই দৈনিক বের না করে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা করা উচিত। কিন্তু মুজফফর সাহেবরা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা ক'রে এক কোম্পানী গঠন করেন। কোম্পানীর শেয়ার অতি অল্পই বিক্রী হয়; পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ এখানেই থেমে থাকে।

নজরুলের প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালের প্রথম দিকে। কবিতার বই নয়, "ব্যথার দান" নামে এক কাব্যধর্মী গল্প সমষ্টি। "ব্যথার দান" গল্পটির কথা আগে বলা হয়েছে, সে গল্পটি দিয়েই "ব্যথার দান" বইয়ের শুরু। এরপর

প্রকাশিত হয় "রিক্তের বেদন" তাও এক গল্প সমষ্টি। ঐ সময়েই নজরুল অধুনা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত কুমিল্লা শহরে গিয়ে অনেক দিন বাস করেছিলেন। সেখানেও তিনি অনেক কবিতা রচনা করেন—"প্রলয়োল্লাস" নামে কবিতাটি তারমধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অসহযোগ আন্দোলন দেশে যে মাতন জাগিয়েছিলো কবিতাটি তাই নিয়ে লেখা। কেউ কেউ আবার তার মধ্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। নজরুলকে কুমিল্লা থেকে নিয়ে আসা হয় "সেবক" পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখবার জন্যে। "সেবক" ছিল দৈনিক পত্রিকা ঃ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ঐ কাগজ চালাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যিক এবং সে সময়ের একজন কংগ্রেস নেতা। পরে তিনি মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন। "সেবক"য়ে কাজ করার সময়ে নজরুল "ধূমকেতু" নামে সাপ্তাহিক প্রকাশের পরিকল্পনা করে ১৯২২ সালের ১২ই আগষ্ট তার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যায়ই অবিস্মরণীয় এই কয়টি লাইনে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ প্রকাশিত হয় ঃ

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয়কেতন!
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

শরৎচন্দ্রও আশীর্বাদবাণী পাঠিয়েছিলেন এই বলে "যেন শত্রু মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তারপর

ভগবান তোমাদের কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।” পত্রিকাটিতে ফুটে উঠলো দুরন্ত বৈপ্লবিক আবেগ—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর তার প্রভাব হলো অপরিসীম। “ধূমকেতু”তে নজরুল অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রশস্তি গাইতেন বটে, কিন্তু মতবাদ হিসেবে অহিংসাতে তাঁর দৃঢ় আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী, মনে-প্রাণে স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ, হিংসা অহিংসার প্রশ্ন তাতে ছিল অবান্তর। অসহযোগ আন্দোলনকে প্রভাব বিস্তারের ও সাফল্যের সুযোগ দেবার জন্য বিপ্লবী আন্দোলন ঐ সময়ে স্থগিত রাখা হয়েছিল ; কিন্তু “ধূমকেতু” জনগণের বিদ্রোহী আত্মাকে জাগিয়ে রেখে সপ্তাহের পর সপ্তাহ তার খোরাক যোগাতো। বিপ্লবীরা এ জন্য “ধূমকেতু”কে খুব পছন্দ করতেন, তাঁদের কেউ কেউ “ধূমকেতু”র সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্তও হয়েছিলেন। রাজনীতির জন্য যে সাহিত্যসেবা—তাতে “ধূমকেতু” নজরুলের জীবনে এক বিরাট পদক্ষেপ। বৃটিশ শাসন থেকে পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এর মূলমন্ত্র। অচিরেই তাঁর উপর সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণমেণ্টের রোষদৃষ্টি পড়লো। “আনন্দময়ীর আগমনে” নামে একটি কবিতা প্রকাশের জন্য নজরুল রাজদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার হ’লেন। কবিতাটির মর্ম্ম প্রথম কয় লাইন থেকেই বোঝা যাবে ঃ

“আর কতকাল থাকবি বেটী মাটির ঢেলার মূর্ত্তি আড়াল !
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি-চাঁড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি,
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা,—আসবি কখন সর্বনাশী ?
দেব-সেনা আজ টানছে ঘানি তেপান্তরের দ্বীপান্তরে,
রণাঙ্গনে নামবে কে আর তুই না এলে কৃপাণ ধরে ?

মহাত্মা গান্ধীর ইতিমধ্যে ছয় বৎসর কারাদণ্ড হয়েছে ; শ্রীঅরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে যোগাসনে আসীন :

"বিষ্ণু নিজে বন্দী আজি ছয়-বছরী ফন্দি-কারায়,
চক্র তাহার চরকা বুঝি ভণ্ড হাতে শক্তি হারায়।
মহেশ্বর আজ সিন্ধুতীরে যোগাসনে মগ্ন ধ্যানে,
অরবিন্দ চিত্ত তাহার ফুটবে কখন কে সে জানে !"

দীর্ঘ কবিতার উপসংহারে কবি আহ্বান জানাচ্ছেন :

"দুর্বলেরে বলি দিয়ে ভীরুর এ হীন শক্তি পূজা
দূর ক'রে দে, বল্ মা, ছেলের রক্ত মাগে মা দশভূজা।
সেই দিন জননী তোর সত্যিকারের আগমনী,
বাজ্‌বে বোধন-বাজনা সেদিন গাইব নব জাগরণী।
'ম্যয় ভুখাহুঁ মায়ি' ব'লে আয় এবার আনন্দময়ী
কৈলাস হতে গিরি-রাণীর মা দুলালী কন্যা অয়ি !
আয় উমা আনন্দময়ী।"

"ধূমকেতু"তে—"বিদ্রোহীর কৈফিয়ৎ" নামে প্রকাশিত একটি লেখাও অভিযোগের বিষয়বস্তু করা হয় : সে লেখাটি ছিল একটি বালিকার। নজরুলের বিচার হয়ে ১৯২৩ সা'লের জানুয়ারীতে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হলো। নজরুল বিচারালয়ে এক বিবৃতি দিয়েছিলেন : "রাজবন্দীর জবানবন্দী" নামক পুস্তিকায় তা ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। জবানবন্দীটি আত্মমর্যাদাবোধ ও আদর্শবাদিতার এক মহিমাময় সংমিশ্রণ। ঐ সময়েই রবীন্দ্রনাথ "বসন্ত" নামে এক নৃত্যনাট্য রচনা করে নজরুলের নামে উৎসর্গ করেন ; কলকাতায় সেটা তিনি অভিনয়ও করিয়েছিলেন এবং স্বয়ং মঞ্চে অবতীর্ণ হন্। নজরুল ছিলেন রাজনৈতিক বন্দী ; সে হিসেবে জেলেও তাঁর বিশেষ ব্যবহার প্রাপ্য ছিল, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাঁকে হুগলী জেলে

স্থানান্তরিত করেন এবং তাঁর প্রতি সাধারণ কয়েদীর ন্যায় ব্যবহার করতে থাকেন। এরই প্রতিবাদে নজরুল অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। এতে জনসাধারণের মধ্যে তাঁরজন্য বিশেষ উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অনশন ভঙ্গের জন্য চারিদিক থেকে তাঁর নিকট অনুরোধ আসতে থাকে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর নিকট তারবার্তা পাঠান কিন্তু সেটা তাকে না দিয়ে ফেরৎ পাঠানো হয়। যা হোক, দেশবাসীর অনুরোধে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন এবং গভর্ণমেণ্টও বিশেষ শ্রেণীর বন্দী হিসেবে তাঁর মর্য্যাদা স্বীকার করে তাঁকে বহরমপুর জেলে পাঠিয়ে দেন। ১৯২৩ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নজরুল মুক্তিলাভ করেন।

নজরুলের প্রথম কবিতার বই "অগ্নিবীণা" ১৯২২ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে "নবযুগ"য়ে প্রকাশিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি সংকলন "যুগবাণী" নাম দিয়ে ছাপা হয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। জেলে থাকা কালে নজরুল বহু রোমান্টিক কবিতা রচনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুদীর্ঘ কবিতা "পূজারিণী"। সেই সব কবিতা লুকিয়ে জেলের বাইরে পাঠানো হয় এবং "দোলনচাঁপা" নামক বইয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। এ কয়টি বইয়েরই প্রকাশক ছিলেন আর্য্য পাবলিশিং হাউস। আর্য্য পাবলিশিং হাউস শ্রীঅরবিন্দের বইয়ের প্রকাশকরূপে সুবিদিত। নজরুল একটি কবিতা লিখে "অগ্নিবীণা" বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বইটির প্রচ্ছদপটের ডিজাইন এঁকে দিয়ে-ছিলেন। সাহিত্যের আমদরবারে সেই হলো নজরুলের সবল পদক্ষেপ।

জেল থেকে বেরিয়ে নজরুল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে সেখানে যান এবং সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি প্রমীলা সেনগুপ্তকে বিবাহ করেন। কুমিল্লায় গিয়ে নজরুল যে পরিবারের সঙ্গে ছিলেন প্রমীলা তাঁদেরই মেয়ে, ত্রিপুরার নায়েব স্বর্গত বসন্তকুমার সেনগুপ্তের কন্যা। তাঁর মার নাম গিরিবালা দেবী। এই আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক বিবাহে কোনো কোনো মহলে আপত্তি উঠলেও তাতে নজরুলের জনপ্রিয়তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। এর অল্প কিছুদিন পর তিনি আবার রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের শ্রমিক স্বরাজ্য পার্টি গঠনে সাহায্য করেছিলেন, তারপর মজতুর কৃষক পার্টি গঠনেও অন্যদের সাথে উদ্যোগী হন। ঐ সব পার্টির নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি ঐ সময়ে মেহনতী জনগণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে যে বিপ্লববাদ প্রসার লাভ করেছিল, "ধূমকেতু" চালাবার কালে তিনি তারই দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন। এবার তিনি "লাঙ্গল" নামে একটি নূতন সাপ্তাহিকের পরিচালনাভার গ্রহণ করেন। ঐ পত্রিকার প্রচ্ছদপটে রবীন্দ্রনাথের এই শুভ কামনা মুদ্রিত হতো—

"জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরু-ভাঙ্গা হল,
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।"

ঐ সময়েই তিনি "সাম্যবাদী" নামে কবিতাগুচ্ছ রচনা করে "লাঙ্গল"য়ে প্রকাশ করেন। এই হৃদয়গ্রাহী কবিতা কয়টিতে ধ্বনিত হয়ে উঠলো নরনারীর সাম্য, গোঁড়ামির অচলায়তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পদানত, অবহেলিত মানুষের দাবী ও অধিকার ; ধর্ম যে কিভাবে সমসাময়িককালে মনুষ্যত্ব বিবর্জিত হয়ে পড়েছে তাই উদ্ঘাটিত হলো এই কবিতার

মাধ্যমে, নারীর মধ্যে বন্দিত হলো মাতৃরূপ—বারাঙ্গনাও সে রূপের বাইরে নয়; আপাতদৃষ্টিতে যে পাপী তারও গোপন সত্তাতে মনুষ্যত্ব আত্মপ্রকাশ পেলো—মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের জয়গান উঠলো। নজরুলের "কৃষকের গান" ও "লাঙ্গল"য়ের জন্যই লেখা। "সব্যসাচী" নামে উদ্দীপনাময় কবিতাও প্রথমে "লাঙ্গল"য়ে প্রকাশিত হয়েছিল, "ফনিমনসা" বইয়ে তা ছাপা হয়েছে।

এই সময়েই নজরুল অনেক সময়ে হুগলীতে থাকতেন, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও ঐ সময়েই হয়। নজরুল মহাত্মাজীকে "চরকার গান" গেয়ে শুনিয়েছিলেন, মহাত্মা তাতে মুগ্ধ হন্। মহাত্মার বাংলা দেশে আগমন উপলক্ষে নজরুল এক প্রাণ মাতানো গান রচনা করেন। প্রথম লাইন কটি এই:

"আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফোটানো
পা মেলে।"

নজরুল হুগলীতে থাকা কালেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু ঘটে, সারা দেশ শোকস্তব্ধ হয়ে যায়। বহু গান ও কবিতা নজরুল ঐ উপলক্ষে রচনা করেন: ভাবগাম্ভীর্যে, ছন্দসৌকর্যে, সুরমাধুর্যে ও শব্দ যোজনায় সে সব অতুলনীয়। অচিরে "চিত্তনামা" বইয়ে সে সব প্রকাশিত হয়। হুগলীতে থাকা কালে নজরুল একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, সে অবস্থায়ই "ঝড়" নামে এক দীর্ঘ কবিতা লেখেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে কবিতাটি "বিষের বাঁশী"তে রয়েছে। ঐ সময়ে নজরুল নিমন্ত্রিত হয়ে বাঁকুড়া জেলায় অন্তর্গত গঙ্গাজলঘাটিতে

যান্ এবং সেখানে "অমর কানন" নামে জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করেন। জনৈক দেশ সেবকের অক্লান্ত সাধনায় বিদ্যালয়টি গড়ে উঠেছিল। নজরুল "অমর কানন" নামে একটি গানও রচনা করেন। বাঁকুড়াতে যুব ও ছাত্র সম্মেলনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি নিকটবর্তী বিষ্ণুপুর শহরে যান, সেখানে একটি পুরোনো দুর্গ ও কামান অতীতে স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্বের পরিচয় বহন করছে। আবেগভরে তিনি কামানটিকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং তাতে হেলান দিয়ে ছবি তোলেন। ১৯২৫ সালের শেষ পর্যন্ত নজরুল হুগলীতে থাকেন—তারপর কৃষ্ণনগরে যান্ এবং সেখানে আড়াই বৎসর কাল ছিলেন। সে সময়টা খুবই স্মরণীয়, নজরুল সেখানে কর্মোন্মাদনায় মেতে ছিলেন। কৃষ্ণনগরে ঐ সময়ে অনেকগুলো সম্মেলন হয়, নজরুল প্রত্যেকটার উপযোগী গান রচনা করে নিজেই সম্মেলনে গেয়েছিলেন। প্রথমে হয় নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলন: নজরুল তাতে গেয়েছিলেন "শ্রমিকের গান।" কৃষ্ণনগরে এ সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল ছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সক্রিয় কর্মী; সম্মেলন উপলক্ষে তিনি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। এই সম্মেলনেই তিনি গেয়েছিলেন স্বরচিত "কাণ্ডারী হুশিয়ার" দেশাত্মবোধক কোরাস গান হিসেবে বুঝি তার তুলনা নেই। ছাত্র সম্মেলনে তিনি গেয়েছিলেন "আমরা ছাত্রদল", যুব সম্মেলনে 'চল্ চল্ চল্'—ঐ গান দুটি এখনও ছাত্র ও যুবকদের প্রেরণা দিয়ে থাকে। কৃষ্ণনগরে থাককালে নজরুল একটি নৈশ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ সময়ে তিনি একবার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সে সময়ে পৃথক নির্বাচন চালু ছিল। কংগ্রেস নজরুলকে মনোনয়ন দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর সাফল্যের জন্য কোনা চেষ্টা করেনি, ফলে নজরুলের নির্বাচনে দাঁড়ানোই সার হলো। ঐ সময়ে নজরুল সাম্প্রদায়িক চুক্তি, ঔপনিবেশিক, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতির উপর কতগুলো ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লেখেন। "চন্দ্রবিন্দু" নামক বইয়ে সে সব প্রকাশিত হয়, কিন্তু সে বইও বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। কৃষ্ণনগরে থাকতেই নজরুল "দারিদ্র" নামে এক মর্মস্পর্শী কবিতা লেখেন, 'কল্লোল' নামক পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। কল্লোল ছিল রবীন্দ্র-পরবর্তী সাহিত্যিকদের পত্রিকা। দুঃসাহসিক ভাবধারার প্রকাশে তা' তখন তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। "কালিকলম"ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত "প্রগতি"ও কল্লোল যুগের পত্রিকা ঃ নজরুল ঐসব পত্রিকায়ও লিখতেন। তিনি ঐ সময়ে একবার ঢাকায় যান এবং সেখানে সোৎসাহ অভ্যর্থনা লাভ করেন। "সৃষ্টিসুখের উল্লাসে" নামক তাঁর কবিতাটিও "কল্লোল"য়ে প্রকাশিত হয়। কমুনিষ্ট "ইণ্টারন্যাশন্যাল সংগীত"য়ের একটি অনুবাদও তিনি "অন্তরন্যাশন্যাল সংগীত" নাম দিয়ে "গণবানীতে" প্রকাশ করেন। ইতিমধ্যে "লাঙ্গল" বন্ধ হয়ে গিয়ে গণবাণী বেরুচ্ছিল। কৃষ্ণনগরে নজরুল "কুহেলিকা" ও "মৃত্যু ক্ষুধা" নামে দুটি উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাস দুটিতে বৈপ্লাবিক কর্তব্যের সঙ্গে হৃদয়াবেগের সংঘাত দেখানো হয়েছে এবং রাজনীতিই মুখ্য হয়ে পড়েছে, শিল্পগুণ ততটা পরিস্ফুত হতে পারেনি। "কুহেলিকা"র প্রথমাংশ এবং "ঝিলিমিলি" ও "সেতুবন্ধ" নামে দুটি নাটক ১৯২৭ সালে "নওবোজ" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। "নওরোজ" পত্রিকা বার করেছিলেন কবি বেনজীর আহমদ। কবি হ'লেও বৈপ্লবিক কার্যকলাপে তাঁর

দুঃসাহসিকতা কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো: নজরুল নিজে বেনজীরের প্রথম কাব্যপুস্তক "বন্দীর বাঁশীর" মুখবন্ধে লিখেছিলেন "মুসলমান তরুণদের মধ্যে সে সত্যই বে-নজীর: এমন আর একটিও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না।" "নওরোজ"য়ের উপর বহু ঝড়ঝাপটা আসে—মাত্র পাঁচ মাস ছিল তার আয়ুষ্কাল।

১৯২৬ সালে কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগে। নজরুলের অন্তরাত্মা প্রতিরোধে গর্জে ওঠে "গণবাণী"তে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে এবং বহু কবিতায়। প্রবন্ধগুলি "রুদ্রমঙ্গল" নামে একটি বইয়ে একত্র প্রকাশিত হয় এবং কবিতাগুলি "ফণিমনসা" নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। "ছায়ানট" ও "পূবের হাওয়া" নামে দুটি কবিতার বইও ঐ সময়ে প্রকাশিত হয় এবং "সাম্যবাদী" নামে পূর্বোক্ত কবিতাগুলি সে নামেরই একটি বইয়ে প্রকাশ লাভ করে। "সর্বহারা", "জিঞ্জীর", "সন্ধ্যা" এই তিনটি বইও ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়। নজরুল ঐ সময়ে চট্টগ্রাম ও নোয়াখালি জেলার সন্দীপে ভ্রমণ করতে যান—ফলে বহু অপূর্ব কবিতা রচিত হয়। চট্টগ্রামের সমুদ্র সন্দীপ দ্বীপপুঞ্জের শোভা তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে, প্রকৃতির ও প্রেমের কবিতায় তাঁর প্রাণ মুখর হয়ে ওঠে। "সিন্ধু-হিন্দোল" ও "চক্রবাক" বই দুটিতে সে সব কবিতা সংকলিত হয়েছে। অন্য ধরণের অনেক বইও ঐ সময়ে বেরোয়—দুটি প্রবন্ধের বই তাদের মধ্যে "রুদ্রমঙ্গল"য়ের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, অন্যটি "দুদিনের যাত্রী"। পত্রোপন্যাস "বাঁধনহারা"র কথা পূর্বেই বলা হয়েছে, "মৃত্যু-ক্ষুধা" উপন্যাসের নামও পূর্বে উল্লেখ করেছি, পুস্তকাকারে এরা ঐ সময়ে প্রকাশলাভ করে। "ঝিঙ্গে ফুল" ও "সাত ভাই চম্পা" নামে

শিশুদের জন্যে দুটি কবিতার বই, "ঝিলিমিলি" নামে নাটিকা-গুচ্ছ, শিশুদের জন্য "পুতুলের বিয়ে" নামক নাটিকা এবং তিনটি গানের বইও ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়। নজরুল তাঁর প্রথম গানের বই "বুলবুল", তাঁর বন্ধু প্রখ্যাত গায়ক ও লেখক দিলীপ কুমার রায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। অন্য দুটি বইয়ের নাম "চোখের চাতক" ও "নজরুলগীতি"। "সঞ্চিতা" নামে নজরুলের কবিতা সংগ্রহের প্রথম সংস্করণ ঐ সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল, বইটি রবীন্দ্রনাথের "শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে" উৎসর্গী-কৃত।

১৯২৯ সালের শেষভাগে নজরুলকে কলকাতায় জনসম্বর্ধনা জানানো হয়। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন; বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাতে যোগ দিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যতম বক্তা ছিলেন তখনকার দিনে তরুণ দেশনায়ক সুভাষ চন্দ্র বসু। নজরুলের প্রাণমাতানো গান ও কবিতার গুণগান করে সুভাষচন্দ্র বলেন, ভারতের কোথাও তিনি "কাণ্ডারী হুসিয়ার"য়ের মতো উদ্দীপনাময় কোরাস গান শোনেন নি। এই দশক যখন শেষ হয়ে আস্‌চে তখন কবির পুত্র বুলবুল গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়ে। নজরুল ঐ সময়েই মূল ফার্সী থেকে রুবেয়ায়াৎ-ই-হাফিজের অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন। "প্রলয় শিখা" নামে কবিতার বইও ১৯৩০ সালের প্রথমভাগে প্রকাশিত হয়। "নব ভারতের হলদিঘাট" নামে কবিতাও ঐ বইয়ের অন্তর্ভুক্ত: উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় বুড়া বালাং নদীতীরে বাঘা যতীন ও তাঁর সহচরেরা বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পুলিশবাহিনীর সঙ্গে যে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন দেন, কবিতাটি তারই অনুপম বন্দনাগীতি। বইটি বাজেয়াপ্ত হয়, নজরুলের বিচার হয়ে ছয় মাস কারাদণ্ডও হলো; কিন্তু গান্ধী-আরউইন

চুক্তি অনুসারে যখন সব রাজনৈতিক বন্দী কারামুক্ত হলেন, তখন নজরুলও ছাড়া পেলেন। ১৯২০ থেকে ১৯৩০—এই দশ বছর নজরুল পূর্ণ রূপে রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনিই বোধ হয় একমাত্র কবি ও সাহিত্যিক যিনি বল্‌তেন, মাতৃভূমির মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজনীতিই তাঁর জপতপ, মুক্তিসাধনা থেকে দূরে থেকে একান্তে সাহিত্য সাধনা তাঁর জন্য নয়। দেশের মানুষের জীবনে তাঁর স্থিতি: সে জীবনই তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের উৎস। সে জীবনে ধ্বনিত হলো অধীনতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহের বাণী—আজও সে বাণী ক্ষণে ক্ষণে মানুষকে চকিত করে তোলে। কারণ, উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আজও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে, অত্যা-চারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণরণিয়ে উঠ্‌ছে। কবি নজরুল যদিও আজ মূক, তাঁর অশান্ত আত্মা বিদ্রোহের বাণীতে যুব জনমনকে চঞ্চল করে তোলে, মানুষের সর্বাংগীন মুক্তির অভিযানে প্রেরণা যোগায়। বাঙ্গালীর জীবনে কবি বিদ্রোহীর এই শাশ্বত আবির্ভাব।

তৃতীয় অধ্যায়

মুক্তি সংগ্রামে

স্বদেশের সঙ্গে যে একাত্মতা কবি নজরুলের বাঁশীতে আকুল মূর্চ্ছনা তুলেছিল, তাঁর গদ্য রচনায়ও তা প্রবল উন্মাদনা এনে দিতো। পত্র-পত্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধ জনসাধারণের উদ্দীপ্ত আগ্রহ জাগিয়েছিলো। বিশেষ করে "ধূমকেতু"তে তাঁর লেখা পড়বার জন্য তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। প্রবীণ লোকদের মনে আছে এবং তাদের কেউ কেউ স্মৃতি-কথায় লিখেওছেন যে "ধূমকেতু" যে দিনটিতে প্রকাশিত হবার কথা সেদিন জনসাধারণ রাস্তার মোড়ে মোড়ে হকারদের জন্য অপেক্ষা করতেন: কাগজ এসে পৌঁছালে কাড়াকাড়ি পড়ে যেতো। এ সব কাগজ কিন্তু রক্ষা করা যায়নি। তদানীন্তন গভর্ণমেণ্ট ঐগুলো বাজেয়াপ্ত তো করতেনই তা'ছাড়া একদম নষ্ট করে দেওয়ার প্রযাস পেতেন। ব্যক্তিগতভাবে কারু কারু কাছে দু'একখানা কপি থেকে গিয়েছিল। সে সব সংগ্রহ করে পরে "ধূমকেতু" নাম দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তা' থেকে দেখা যায়, "ধূমকেতু"তে নজরুল লিখতেন শুধু জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য, এমন ধারণা সত্য নয়। তাঁর লেখা জনগণের মনে এতটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতো—ঐ থেকে এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে সে লেখা প্রধাণত আবেগধর্মী ছিল। আবেগ তাতে ছিল বটে কিন্তু যুক্তির স্থানও ছিল উচ্চ। তাতে জনসাধারণকে শুধু আবেগের দ্বারা চালিয়ে নেবার চেষ্টা ছিল না; তাদের চিন্তার খোরাকও যথেষ্ট দেওয়া হতো। নজরুল কাউকেই কোনো মত চিন্তা না করে গ্রহণ কর্‌তে বল্‌তেন না, প্রত্যেক বিষয়ের ভালোমন্দ চিন্তা করে যুক্তিসহ বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত কর্‌তে বল্‌তেন।

"ধূমকেতুর পথ" নামে তিনি যে প্রারম্ভিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে বলেছেন "অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেছেন 'ধূমকেতু'র পথ কি? সে কী বল্‌তে চায়? এর দিয়ে কোন মঙ্গল আসবে? ইত্যাদি।" জবাব দিতে গিয়ে নজরুল বলছেন "সর্বপ্রথম ধূমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝিনা, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে।" তিনি আরও বললেন—"পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে। সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে।" আর "আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তার বেশী বুঝবার ভান করে যেন শ্রদ্ধা বা প্রশংসা পাবার লোভ না করি। তা সে মহাত্মা গান্ধীরই মত হোক, আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই মত হোক। আমি সত্যিকার প্রাণ থেকে যেটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীর বাণীর আহ্বানে ঠিক ততটুকু মান্‌ব। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে, তবে তাঁদের মানব না।" কিন্তু "আমাদের সকলের মধ্যে নিরন্তর এই ফাঁকির লীলা চলছে। এই বাংলা হ'য়ে পড়েছে ফাঁকির বৃন্দাবন।" নজরুল বল্‌ছেন "অনেকেই লোভের বা নামের জন্য মহাত্মা গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনে নেমেছিলেন, কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়ে নেমেছিলেন বলে অন্তর থেকে সত্যের জোর পেলেন না। আপনি সরে পড়লেন। রবীন্দ্র, অরবিন্দ ভক্তদের মধ্যেও ঐ একই প্রবঞ্চনা ফাঁকি এসে পড়েছে।" নজরুল আহ্বান দিলেন "অত্যাচারীকে অত্যাচারী বল। তাতে

আসে আসুক বাইরের নির্যাতন, ইংরেজের মার, তাতে তোমার অন্তরের আত্মপ্রসাদ আরো বেড়েই চলবে, মিথ্যাকে মিথ্যা বল্‌লে, অত্যাচারীকে অত্যাচারী বল্‌লে যদি নির্যাতন ভোগ করতে হয় তাতে তোমার আসল নির্যাতন ঐ অন্তরের যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। প্রাণের আত্মপ্রসাদ যখন বিপুল হ'য়ে ওঠে, তখন নির্যাতনের আগুন ঐ আনন্দের এক ফুঁতে নিভে যায়।" প্রবন্ধটিতে স্পষ্ট ইংগিত রয়েছে যে 'ধূমকেতু' অহিংসা ধর্মকে আঁকড়ে বসে থাকবে না। "সত্যকে জাগাবার জন্য বিদ্রোহ চাই, নিজেকে শ্রদ্ধা-প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই।" "আমার ধর্ম" নামক প্রবন্ধে নজরুল বলেছিলেন "দেশে একটা কথা উঠেছে যে মুক্তির জন্য যে আন্দোলন তা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করে নিতে হবে......... আমাদের ধর্মের ভেতর দিয়ে চলতে হবে।" কিন্তু কিসের ধর্ম? আমার বাঁচাই আমার ধর্ম। দেবতার ঝড় জলকে আমি বাঁধবো, প্রকৃতিকে আমি প্রতিঘাত দেবো। আচারের বোঝা ঠেলে ফেলে দেবো, সমাজকে ধ্বংস করবো। সব ছারখারে দিয়েও আমি বাঁচবো। আমার আবার ধর্ম কি? যার ঘরে বসে কথা কইবার অধিকার নেই, দুপুর রাতে দুঃস্বপ্নে যার ঘুম ভেঙ্গে যায়, অত্যাচারকে চোখ রাঙ্গাবার যার শক্তি নেই তার আবার ধর্ম কি?......মানুষের দাস তুমি, তোমার আবার ধর্ম কি? তোমার ধর্মের কথা বলবার অধিকার কি? তরুণকে, লক্ষ্মীছাড়ার দলকে ডেকে নজরুল বলেছেন, তারা যেন এ ভণ্ডামী থেকে চলে আসে। যারা বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তিল তিল করে মরতে চলেছে—তাদের কথা ভাবো। বাঁচবার কথা ভাবো। তারা বুঝেচে বাঁচাই তাদের ধর্ম। "মহরম" পর্ব নজরুল স্বাধীনতার সম্বন্ধে উদযাপিত করার

ডাক দিলেন। কাউন্সিলে যাওয়া না যাওয়া নিয়ে এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে যে তর্ক উঠেছিল তাতে বীরজনোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানালেন। দেশের লাঞ্ছিত জনকে নিজ অধিকার আদায় করে নিতে মহাত্মা গান্ধী যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাতে বাবুরাজনীতিকদের ভীরু প্রতিক্রিয়াকে নজরুল তীব্র কশাঘাত হেনেছেন। "বিষবাণী"তে দেশ-দ্রোহীদের প্রতি তাঁর ক্ষমাহীন ঘৃণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। "আনন্দমঠ"য়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীকে চূড়ান্ত পণ দেবার যে ডাক দিয়েছিলেন তাই স্মরণ ক'রে নজরুল তরুণদের সর্বস্ব পণ দেবার আহ্বান জানালেন—জীবন ভিক্ষা দেবার আহ্বান। সে আহ্বান যুবশক্তিকে উদ্দীপ্ত করেছিলো। তরুণদের মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক হবার আহ্বানও তাদের কর্মচঞ্চল করে তুললো। বিশ্বসাহিত্যের উপর একটি প্রবন্ধে নজরুল সাহিত্যিকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন : (১) যাঁরা শুধু রোমান্টিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন (২) যাঁরা মানুষের দুঃখ বেদনাকেও তাঁদের সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন, কিন্তু তা মোচনের জন্য সক্রিয় উদ্যোগে নিজেদের যুক্ত করেন নি (৩) যাঁরা সাহিত্য সাধনার সঙ্গে সঙ্গে কর্মের আহ্বানও জানিয়েছেন—যথা, ম্যাক্সিম গোর্কী। নজরুল ইসলাম যদিও শেষোক্ত শ্রেণীরই বিশেষ অনুরাগী, নিছক সৃজনশীল সাহিত্যিকদেরও তিনি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। "ম্যয় ভুখা হুঁ" নামে একটি রূপক রচনাতে দেশের দুর্দশাতে নজরুলের বেদনা ও আশা উন্মত্ত আবেগে ফুটে উঠেছে। এক পাগলিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে আর শুধু বলছে "ম্যয় ভুখা হুঁ।" ছেলের দল তাকে জিজ্ঞেস করছে সে কী চায়, অন্ন বা বস্ত্র চায় কি না। পাগলিনী কেবলই বলে "ম্যয় ভুখা হু।" নিস্তব্ধ রাতে বন

থেকে কাপালিক বেরিয়ে এলো, বললো "বেটী রক্ত চায়।" দেখা গেলো, পাগলিনী ছিন্নমস্তা হয়ে আপন রুধির আপনি পান করছে আর শুধু বলছে "ম্যয় ভূখা হুঁ।" ছেলেরা বুঝতে পেরে ঠিক করলে রক্তযজ্ঞ করবে। তারাই মায়ের পূজার বলি হলো। পরদিন দেখা গেলো, অন্নপূর্ণা দশ হাতে করুণা, স্নেহ বিলোচ্ছে। মৃত্যুঞ্জয়ী ছেলেগুলোও বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বুকের রক্ত বিসর্জন দিয়ে অমর জীবন লাভ—নজরুলের প্রবন্ধের দিক-নির্দেশ বাংলার তরুণেরা বুঝতে ভুল করেনি।

মুস্তাফা কামাল পাশার উপর একটি নিবন্ধ—কামালের উপর নজরুল যে কবিতা লিখেছিলেন তারই সঙ্গে এক সুরে বাঁধা। মানুষের ব্যর্থতার, বেদনার সাধনায়ও একদিন চরম সার্থকতা নেমে আসে, "ব্যর্থতার ব্যথা" নিবন্ধে নজরুল সে আশ্বাস শুনিয়েছেন। "আমার সুন্দর" শীর্ষক লেখাটিতে নজরুলের অন্তরবিবর্তনের একটা সুষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, "নবযুগ" পত্রিকায় তাঁর যাত্রা শুরু, বিদ্রোহের বাণী নিয়ে তাঁর সুন্দরের অভিযান। কারাবাসের ফলে তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা, রবীন্দ্রনাথের স্নেহাভিনন্দনে তিনি ধন্য। কিন্তু তারপরই সুন্দর এলো শোক-সুন্দর হয়ে—গভীর পুত্র শোকের বেদনা নিয়ে। শোকের প্রতিক্রিয়ায় জাগলো বিদ্রোহ, প্রলয়-সুন্দরের আবাহন। অন্তরের আহ্বানে তিনি কোরাণ, বেদান্ত পাঠ করলেন; কিন্তু সেই উর্ধ মার্গ থেকেই আহ্বান শুনলেন, স্বদেশের ঋণ না শোধ করে তাঁর কোথাও যাবার উপায় নেই। মাটিতে ফিরে আসতে হলো তাঁকে; সেখানে তিনি নানা সমস্যায় বিড়ম্বিত, ঋণগ্রস্ত—সহধর্মিনী পক্ষাঘাতে পঙ্গু। পৃথিবীকে দেখতে পেলেন তিনি ক্ষতবিক্ষত,

নিরানন্দরূপে। তিনি শপথ নিলেন ধরিত্রী মাতাকে আনন্দ-সুন্দর করবার। সুন্দরের রূপ পুনরায় জাগলো তাঁর সামনে। আবার তাঁর সামনে প্রলয়-সুন্দরের আবির্ভাব। তাঁর নিকট অসুন্দর পৃথিবীকে সুন্দর করবার—অসাম্য ভেদ দূর করবার আহ্বান। এই লেখাটি থেকে বোঝা যায়, সুন্দরের সাধনা থেকে নজরুল কী ভাবে প্রলয়-সুন্দরের আবাহনে উত্তীর্ণ হলেন। সুন্দরের সাধনা থেকেই তিনি অসুন্দরকে ধ্বংস করবার আহ্বান পেয়েছেন ঃ তাই তাঁকে রাজনীতিতে বিদ্রোহের অভিযানে উত্তীর্ণ করেছে।

গয়াতে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে তিনি লিখলেন "ভাব্‌বার কথা", "আজ চাই কি"তে দিলেন অসত্য ধ্বংস করবার আহ্বান। স্বাস্থ্য ভঙ্গের দরুণ ময়মনসিংহের প্রজা ও শ্রমিকদের সম্মেলনে যেতে না পেরে যে চিঠি লিখলেন তাতে মাটির সন্তান কৃষকদের, মজুরদের শোনালেন অনাগত দিনের আশ্বাস-বাণী। পূর্ববাংলার করটিয়া কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী ইব্রাহিম খাঁ তাঁকে লিখেছিলেন বিদ্রোহের পথ ছেড়ে ইসলামের শরণ নিতে, অনগ্রসর মুসলিম সমাজের সেবাতে আত্মনিয়োগ কর্‌তে। তা' যদি করেন তবে জালালউদ্দীন রুমী ইরাণে যে স্থান লাভ করেছিলেন নজরুলও তেমনি স্থানের অধিকারী হবেন। উত্তরে কবি লিখ্‌লেন যে সমস্ত দেশকেই বিদ্রোহের বাণী দিয়ে জাগাতে হবে, শুধু মুসলমান সমাজ নিয়ে থাক্‌তে তিনি অসমর্থ। হাফিজ, রুমীও বিদ্রোহী ছিলেন। আজ দরকার আঘাত দিয়ে সমাজকে জাগাবার, তাই দরকার বিদ্রোহেরও। তিনি হিন্দু-মুসলিম একতার সাধনার শপথ গ্রহণ করেছেন—শিল্পকেও সে উদ্দেশ্যে এবং দেশবাসীর মুক্তি

ও উন্নয়নে নিয়োজিত করবেন। নজরুলের সমাজ দর্শন এই কথা কয়টিতে বিধৃত রয়েছে।

"রুদ্র-মঙ্গল" বইটিতে সংকলিত প্রথম নিবন্ধে নজরুল পদানত, অবহেলিত জনগণকে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়েছেন। "আমার পথ"য়ে তিনি বলছেন, আমাদের প্রত্যেককেই নিজের উপর নির্ভর করতে হবে : গান্ধীজী আছেন বলেই যে আমরা নিষ্ক্রিয় হ'য়ে থাক্‌বো, তা হবে না। "ক্ষুদিরামের মা", শীর্ষক প্রবন্ধটি যেন পাঠকের শিরায় শিরায় কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

"আঠারো মাসের পরে
জনম নেবো মাসীর ঘরে, মাগো,
চিন্‌তে যদি না পার মা
দেখ্‌বে গলায় ফাঁসি—"

নজরুল বল্‌ছেন, সেদিন থেকে যে সব ছেলের জন্ম হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই পুনর্জাত ক্ষুদিরাম। তিনি তাদের মায়েদের আহ্বান জানাচ্ছেন স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য তাদের ছেড়ে দিতে। "মন্দির মসজিদ"য়ে, দেখানো হয়েছে, পায়ে-দলা মাটি দিয়ে ইট তৈরী ক'রে মন্দির মসজিদ রচিত হ'ল এবং তাদেরই দরুণ শত শত মানুষের প্রাণ গেলো, এমনই মূর্খ আমরা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিন্দু মুসলমান সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার পর নজরুল লেখেন "হিন্দু-মুসলমান"— মানুষ কী রকম মনুষ্যত্ববর্জিত হ'য়ে পড়েছে সে চিত্র ফুটিয়ে তোলেন। এর পর আছে কয়েকটি অভিভাষণ। ১৯২৯ সালের শেষ ভাগে নজরুলকে কলকাতার জনসাধারণের পক্ষ থেকে যে অভিনন্দন দেওয়া হয় তার উত্তরে ও সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত তরুণ মুসলিম সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে নজরুল

আহ্বান জানান তাদের আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হ'তে। তিনি বলেন, হিন্দু মুসলমানকে পরস্পরের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'বে ঃ তবেই তাদের পারস্পরিক সমঝোতার বাধা দূর হ'তে পারবে। হিন্দুরা তাদের প্রাচীন সাহিত্য বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতে অনুবাদ করেছেন, কিন্তু মুসলমান-দের ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস আরবী, ফার্সী ও উর্দুতে নিহিত রয়েছে ঃ সেখ'ন থেকে উদ্ধার ক'রে মাতৃভাষায় আনা হয়নি। নজরুল মুসলমান তরুণদের এই কাজে আত্মনিয়োগ করবার ডাক দেন্।

অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, মানুষে মানুষে ভেদ দূর করা, সর্বপ্রকার অধীনতা, লাঞ্ছনা থেকে মানুষের মুক্তি—নজরুল ইসলামের গদ্যরচনার এই মূল সুর। প্রথম থেকেই যে সব রাজনৈতিক লেখা তিনি লেখেন তাতে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ—সবাইর ঐক্য ধ্বনিত হয়েছিলো। কিন্তু তা শুধু মামুলী প্রচার নয়—অধিকারের জন্য সংগ্রাম, কঠোর কর্ত্তব্যসাধনা তার অন্তর্গত। "নবযুগ"য়ে তিনি যে সকল সন্দর্ভ লিখেছিলেন "যুগবাণী" পুস্তকে সে সব ছাপা হয়। পূর্বেই বলা হ'য়েছে যে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পর পুনরায় ছাপা হয়েছে। তাদের মধ্যে "ধর্মঘট"য়ের উপর লেখা আছে। শ্রমিক শ্রেণী নিজের দাবী আদায়ের জন্য সে সময়ে ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। "লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে কলিকাতার দৃশ্য" প্রবন্ধটি পরলোকগত নেতার অভিপ্রায় পূর্ণ করার জন্য হিন্দু মুসলমান ঐক্যের উদ্দীপ্ত আহ্বান। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযান এবং তথাকথিত তফ্‌সিলভুক্ত জাতিদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধন নিয়েও জোরদার লেখা রয়েছে—জাতীয় শক্তির

সামগ্রিক জাগরণ এ সব লেখার লক্ষ্য। "তুদিনের যাত্রী" নামক বইয়ে নজরুলের যে সব লেখা বেরিয়েছিল সে সব তুরন্ত আবেগে ভরা। "আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল" প্রবন্ধে তিনি ঘরছাড়া, পথহারা তরুণদের আহ্বান জানাচ্ছেন তারা যেন তাঁর সঙ্গে গিযে নিজেদের জীবন দিয়ে নূতন পৃথিবী গড়ে তোলে, নজরুলের সব লেখারই আছে সাহিত্যিক জলুস, আছে বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য। তা ছাড়াও এদের মূল্য এই যে এ সব বেরিয়েছিল আধুনিক বাংলার ইতিহাসের এক প্রাণচঞ্চল যুগে : এ'সব পড়্‌লে যেন সে সময়ের দেশবাসীর আদর্শোদ্দীপ্ত, প্রাণোচ্ছল জীবন নূতন ক'রে উপলব্ধি করা যায়। নজরুলের রাজনৈতিক লেখা সে যুগের চিরকালের সাক্ষী।

চতুর্থ অধ্যায়

সুন্দরের সন্ধানে

অসুন্দর ও অসত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রেছেন নজরুল ইসলাম, তাই তিনি রাজনীতিতে নেমে দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দিয়েছেন। পতিত যারা, লাঞ্ছিত যারা তাদের শৃঙ্খল মোচনের অভিযানে আহ্বান ক'রেছেন। বাংলা দেশে তাঁকে নিছক রাজনৈতিক কবি বলার উন্নাসিকতারও অভাব হয়নি। "আর্টস ফর আর্টস সেক্" করেন যাঁরা, যাঁরা দেশের দুর্দশা মানুষের লাঞ্ছনার ছোয়াচ বাঁচিয়ে চলেন, তাঁরা নজরুলকে একটু কৃপাদৃষ্টিতেই দেখেন। ঐ জন্যই নজরুলকে লিখতে হয়েছিল: "বেদনাসুন্দরের পূজা যাঁরাই করেছেন, তাঁদের চিরকাল একদল লোক হুজুগে বলে নিন্দা করেছে। আর এরাই দলে ভারী। এরা মানুষের ক্রন্দনের মাঝেও সুর-তাল-লয়ের এতটুকু ব্যতিক্রম দেখলে হল্লা করে যে, ও কান্না হাততালি দেবার মত কান্না হলনা বাপু, একটু আর্টিষ্টিক ভাবে নেচে নেচে কাঁদ! সকল সমালোচনার ওপরে যে বেদনা, তাকে নিয়েও আর্টশালারক্ষী এই প্রাণহীন আনন্দ—গুণ্ডার কুশ্রী চীৎকারে হুইটম্যানের মত ঋষিকেও অ-কবির দলে পড়তে হয়েছিল।" কিন্তু এ বিষয়ে সত্য কী? সত্য এই যে নজরুল একান্তভাবেই সত্য সুন্দরের সন্ধানী: তাই যা' অসত্য, যা অসুন্দর তা তাঁকে মর্মান্তিক পীড়া দিয়েছে: তাদের সামনে থেকে সরাতে না পার্লে তাঁর এক মুহূর্ত শান্তি ছিল না। তাঁর শিল্প সচেতন মন দেশের দুর্দশাতে নিদারুণ আহত হয়েছে, দেশের মানুষের দুঃখে যন্ত্রণা পেয়েছে। তাঁর সেই বেদনা—ক্ষোভে, বিদ্রোহে, গানে, কবিতায়, সতেজ গদ্যরচনায় ঝরে পড়েছে। কিন্তু মূলে তিনি কবি, সুন্দরের পিয়াসী—

অসংখ্য গানে, কবিতায়, সুন্দরের জন্য তাঁর সবেদন সাধনা ব্যাকুল প্রকাশ লাভ করেছে। প্রকৃতির আশ্রয়ে, মানব-মানবীর প্রেমে তিনি অনন্তরহস্যের সন্ধান করেছেন : সৃষ্টির সেই লীলা কখনো সুন্দর, কখনো ভয়ালরূপে তাঁর হৃদয়ে মনে ধরা দিয়েছে। সুরে ও ছন্দে তারই প্রকাশ তিন হাজারের উপর গানে এবং একুশটি কাব্যগ্রন্থে বিধৃত রয়েছে। সিন্ধুর উদ্দেশ্যে তিন তরঙ্গের যে কবিতা তাঁর "সিন্ধু-হিন্দোল" গ্রন্থে প্রথম স্থান পেয়েছে, তাই পরিচয় বহন করে তাঁর অনন্ত আকুতির। উত্তাল সিন্ধু তরঙ্গে তিনি দেখেছেন পৃথিবীর ব্যথার মন্থন, শুনেছেন অশ্রান্ত গর্জনে অনন্ত ক্রন্দন : কল্পনানেত্রে নিরীক্ষণ করেছেন যে এই যন্ত্রনা, এই অন্তহীন সন্ধান, অজানার জন্য এই অশ্রান্ত অনুসন্ধান সবই সুন্দরকে পাবার জন্য : সে সুন্দর বিশ্বের এক মহান ঐকতান। চন্দ্রালোকিত সমুদ্র সুন্দরের স্বপ্ন দেখে আনন্দ তরঙ্গে নৃত্য করে। যখন স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে তখন তার যন্ত্রনাও ফিরে আসে। কবি উপলব্ধি করছেন, তাঁর বেদনা ও সমুদ্রের বেদনা একই বেদনা : তিনিও সুন্দরের সন্ধানী :

"এক জ্বালা, এক ব্যথা নিয়া
তুমি কাঁদ, আমি কাঁদি, কাঁদে মোর্ প্রিয়া !"

অবিরত চলেছে এই সন্ধান। দ্বিতীয় তরঙ্গে কবি সমুদ্রের ঢেউকে এই সন্ধানের সৈনিক রূপে দেখেছেন। কবে আসবে তার প্রিয়া, সেই আশাতে মুক্তা-বুকে মালা রচনা করে শত শুক্তি-বধূ অপেক্ষা করছে, প্রবাল গাঁথছে রক্ত-হার। দীপান্বিতা-বধূর জন্য নব নব দ্বীপে প্রমোদ-কানন রচিত হচ্ছে।

সিন্ধু-পোত চলে পোষা কপোত-কপোতীর মতো, নাম-না-জানা কত পাখী উড়ে যাচ্ছে :

"শ্রান্ত মাঝি গাহে গান ভাটিয়ালী সুরে,
ভেসে যেতে চায় প্রাণ দূরে—আরো দূরে,
সীমাহীন নিরুদ্দেশ পথে
মাঝি ভাসে, তুমি ভাস, আমি ভাসি স্রোতে !"

কিন্তু সহসা উপলব্ধি জাগে : প্রেম তো প্রেমিককে শুধু দুর্বল করে না, মহীয়ানও করে তোলে। তাই জোয়ারে তার ব্যথা উচ্ছসিত হয়ে ওঠে, ফেনা হয়ে তীরে আছড়ে পড়ে। তখনই সমুদ্রের সঙ্গে কবিরও দেখা :

"কত কথা আছে—কত গান আছে শোনাবার,
কত ব্যথা জানাবার আছে—সিন্ধু, বন্ধু গো আমার !"

যেখানে ঢেউ নেই, শুধু নিতল সুনিল, সেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মুখোমুখী কথা হবে :

"যেন রবি শশী
নাহী পশে সেথা।
তুমি রবে, আমি রবো—আর রবে ব্যথা !
সেথা শুধু ডুবে র'বো কথা নাহি কহি'—
যদি কই
নাই সেথা দুটি কথা বই,
'আমিও বিরহী, বন্ধু, তুমিও বিরহী !' "

তৃতীয় তরঙ্গে কবি দেখেছেন সমুদ্রের মহান আত্মদান, বিশ্বের তিন ভাগ সে গ্রাস ক'রেছে, কিন্তু এক ভাগ তার কন্যা ধরণী—অপার স্নেহে তাকে সে রক্ষা করে, তাকে প্রাচুর্য্যে ভরে তোলে। সুরাসুর তার রত্নপুর মন্থন ক'রে লুটে নিয়ে গেছে,

তার অমৃত সুধা, তার জীবন নিয়ে তারা সুখে আছে। সমুদ্র আজ রিক্ত, তার—

"আছে শুধু ক্রন্দন-কল্লোল,
আছে জ্বালা, আছে স্মৃতি, ব্যথা-উতরোল!
ঊর্ধে শূন্য, নিম্নে শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!"

তবু সে সুন্দর। সমুদ্র সুন্দরকে কবি জানান্ নমস্কার—

"হে মহান! হে চির-বিরহী!
হে সিন্ধু হে বন্ধু মোর, হে মোর বিদ্রোহী,
সুন্দর আমার!
নমস্কার!
নমস্কার লহ!
তুমি কাঁদ,—আমি কাঁদি,—কাঁদে মোর প্রিয়া অহরহ!
হে দুস্তর আছে তব পার, আছে কূল,
এ অনন্ত বিরহের নাহি পার,—নাহি কূল,—
শুধু স্বপ্ন, ভুল
মাগিব বিদায় যবে, নাহি র'বো আর,
তব কল্লোলের মাঝে বাজে যেন ক্রন্দন আমার!
বৃথাই খুঁজিবে যবে প্রিয়া
উত্তরিও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়া!
তুমি শূন্য, আমি শূন্য, শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার,—সীমাহীন রিক্ত হাহাকার"!

এই যে সুন্দরের সন্ধান—এ সন্ধান গোপন প্রিয়াকে উদ্দেশ ক'রে, অনামিকার মাঝে। কিন্তু এ সন্ধান অসুন্দরে প্রপীড়িত। নির্মম দারিদ্র্য মানুষকে জর্জরিত কর্ছে—"দারিদ্র্য" কবিতাতে সেই মর্মভেদী দুঃখের অনুপম প্রকাশ। সেই অসুন্দরের

মোকাবিলা ক'রেছেন কবি "সিন্ধু-হিন্দোল" বইয়ের শেষ কবিতায় ঃ

"দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জির
খোলো দ্বার, ওঠ ওঠ বীর !
নিদাঘের রৌদ্র খর কণ্ঠে শোনে প্রদীপ্ত আহ্বান—
জয় অভিনব যৌবন-অভিযান !"
"সুন্দর আসিছে পিছে অবগাহি বেদনার জবারক্ত হ্রদে।"
বহু অশ্রুজল সাঁত্‌রে রক্ত-দেবতাস্থলে পৌছেঁছে।
"কোন্ সে বেদনা-পাণি বাণী অশ্রুমতী
করিতেছে তোমার আরতি ?
মন্দির-বেদীর শ্বেত প্রস্তরের আস্তরণ তলে
এলায়িত কুন্তলাকে স্খলিত অঞ্চলে
ছিন্নপর্ণা স্থল-পদ্ম প্রায়
প্রাণহীন দেবতার চরণে লুটায় ?
জানি, তারি স-বেদন আবেদন খানি
খড়্গ হ'য়ে ঝুলে তব করে, শস্ত্রপাণি !
মরণ-উৎসবে রণে ক্রন্দন-বাসরে
নিখিল-ক্রন্দসী, বীর, তব স্তব করে !
বধূ তব নিখিলের প্রাণ
বিদায়—গোধূলি-লগ্নে মৃত্যু-মঞ্চে করে মাল্য দান !"

সেই রক্ত-দেবতাকে কবি বলছেন ঃ

"হে সুন্দর, মোরা তব দূর যাত্রাপথ
করিতেছি সহজ সরল, রচিতেছি তব ভবিষ্যৎ !
সতেজ তরুণ কণ্ঠে তব আগমনী
গাহিতেছি রাত্রিদিন, দৃপ্ত জয়ধ্বনি

ঘোষিতেছে আমাদের বাণী বজ্র-ঘোষ !
বুকে বুকে জ্বালিতেছি বহ্নি-অসন্তোষ !

প্রহরে প্রহরে তিনি হাঁক্‌ছেন ঃ
ওঠ ওঠ বীর,
দ্বারে বাজে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর !
বিপ্লব-দেবতা ঐ শিয়রে তোমার
দাঁড়ায়েছে আসিয়া আবার !
বারে বারে এসেছে দেবতা
যুগান্তের এনেছে বারতা।
বারে বারে করাঘাত করি
দ্বারে দ্বারে হেঁকেছি প্রহরী
নিদ্রাহীন রাত্রিদিন
আঘাতে ছিঁড়েছে তন্ত্রী, ভাঙ্গিয়াছে বীণ
জাগিসনি তোরা
ফিরে গেছে দেবতা সুন্দর, এসেছে কুৎসিৎ মৃত্যু-জরা ॥"
"এবার এ'লগ্ন যেন না হয় বিফল"
"সুপ্তরাতে গুপ্তপথ বাহি
আসিয়াছে অসুন্দর শত্রুর সিপাহী,
অকস্মাৎ
পিছে হতে করেছে আঘাত।
মসিময় করিয়াছে তব রশ্মিপথ,
নিন্দার প্রস্তর হানির রচেছে পর্বত,
পথে পথে খুঁড়িয়াছে মিথ্যার পরিখা,
চোখে মুখে লিখিয়াছে ভণ্ডামীর নীতিবাণী-লিখা,

দলে দলে করিযাছে রিরংসার উলঙ্গ চীৎকার
ফুঁ দিয়া নিবাতে গেছে হে ভাস্কর প্রদীপ তোমার।”

সুন্দরের অনুরাগে চলেছেন কবি ও তাঁর সহযাত্রীগণ ঃ

তারপর প্রশ্ন, তারপর আহ্বান—
“যাদুকর মিথ্যুকের সপ্তসিন্ধুনীর
কতদিনে হ’ব পার, পাব শুভ্র আনন্দের তীর ?
হে বিপ্লব-সেনাধিপ, হে রক্ত-দেবতা,
কহ কহ কথা !
শ্মশানের শিবামাঝে হে শিব সুন্দর
এস এস, দাও তব চরম নির্ভর !
দাও বল, দাও আশা, দাও তব পরম আশ্বাস,
হিংসুকের বদ্ধদ্বার জতুগৃহে আনো অবকাশ !
অপগত হোক্ এ সংশয়
দশদিকে দিগাঙ্গনা গেয়ে যাক্ যৌবনের জয় !
অসুন্দর মিথ্যুকের হোক্ পরাজয়
এস এস আনন্দ সুন্দর, জাগো জ্যোতির্ময় !”

এই তো কবির জীবনদর্শন—দুঃখবেদনার মধ্য দিয়ে সুন্দরের সাধনা আজ জগতে যত অসুন্দর, যত অসত্য তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উন্মুখ, এই অমঙ্গলকে চূড়ান্ত আঘাত এখনই না হান্‌লে নয়। সুন্দরের পূজারী কবির বিদ্রোহের রাজনীতিতে যাওয়ার রহস্যের অর্থ এখানেই নিহিত রয়েছে।

কিন্তু সুন্দরের পূজার কখনও ক্ষান্তি নেই। “দোলন-চাপা”তে রয়েছে কবির দীর্ঘ কবিতা, “পূজারিণী”। বেদনাতে কবির প্রেমের পরিক্রমা, তাতে কবি দেখলেন প্রেম ভিখারী প্রেমিকা আর ভিখারিণী নয়, সে “পূজারিণী”। কিন্তু সে যখন আবার ভিখারিণী হয় তখন সে প্রিয়কেও ভিখারীতে

পরিণত করে। অসহ্য এ দ্বন্দের বেদনা। অবশেষে—

"মরিয়াছে—অশান্ত অতৃপ্ত চিরস্বার্থপর লোভী;
অমর হইয়া আছে — র'বে চিরদিন,
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি!"

কবির এই যে সুন্দরের সন্ধান—এ মানুষের ন্যায় প্রকৃতিকেও ব্যাপ্ত ক'রে আছে: প্রকৃতির লীলায় মানুষের প্রেমও লীলায়িত হ'য়েছে। "চক্রবাক" বইটিতে সংগৃহীত সমুদ্রের ও সমুদ্রপারের কবিতা: প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে ফুটেছে তাতে' কবির জীবনোপলব্ধি।" "বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি" সেই অনির্বচনীয় উপলব্ধির প্রকাশ। তরুমর্মরে মর্মরিত প্রিয়ের বাণী: নিশীথ নিস্তব্ধতায় তরুরাজি দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুরই মতো। কবি চলে যাবার সময়ে দেখ্‌তে পান গাছগুলো যেন অনন্ত প্রতিক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। শিকড় তাদের মাটিতে গাঁথা, সূর্যের খরতাপ তাদের দহন কর্‌ছে, রাত্রির শিশির তাদের সিক্ত ক'রে দিচ্ছে: চকিতে তারা চন্দ্রালোকে আলোকিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। প্রেমের দুঃখদহন কবিকেও তেম্‌নি ক'রে দগ্ধাচ্ছে, গুবাক তরুর সারি এতদিন কবির সাথী ছিল, এখন তাঁর বিদায় আসন্ন: কবি তাই তাদের নিকট অন্তরের কথা নিবেদন করছেন। "শীতের সিন্ধু"তে কবি ফিরে এলেন সমুদ্রের নিকট—সিন্ধুতে আজ নেই বর্ষার হিন্দোলা, কবির হতাশ চিত্ত সেই বিরহ-বিথারে আশ্রয় চেয়ে পায়না। "তুমি মোরে ভুলিয়াছ" কবিতাতে প্রেমের বিচিত্র সর্পিল কুটিল গতি: প্রেমপাত্র শেষে বিস্মৃতিতে ডুবে যায়:

"তুমি মোরে ভুলিয়াছ, তাই সত্য হোক্‌!
নিশি শেষে নিভে গেছে দীপালি-আলোক।

সুন্দর কঠিন তুমি পরশ-পাথর,
তোমাব পরশ লভি' হইনু সুন্দর
— তুমি তাহা জানিলে না !
....সত্য হোক্ প্রিয়া
দীপালি জ্বলিয়াছিল—গিয়াছে নিভিয়া !"

প্রেমের যত ভাবাবেগ, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, ঈর্ষা, অবহেলা বিস্মৃতি—সব কিছু কবি উপলব্ধি করেছেন, মানুষের নিগূঢ় চিত্তে তাদের আঘাত প্রত্যাঘাতকে ভাষায়, ছন্দে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর নিজের চিত্তের তীব্র আবেগও কবিতায় ফুটেছে এবং ধীরে ধীরে তাঁকে নিয়ে গেছে মনের সেই রহস্যলোকে যেখানে তিনি পরম সুন্দরকে লাভ ক'রেছেন ব'লে নিজেই বলেছিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সেখানে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন—আর ফিরিয়ে আন্তে পারেননি। সুন্দরের সন্ধানে কবি মনের অতল তলায় তলিয়ে গেলেন: দেশ আর তাঁকে ফিরে পেলো না। শুধু তাঁর সুন্দরের সাধনার সাক্ষী র'য়ে গেলো কবিতার পর কবিতা, গানের পর গান॥

সুর সঙ্গমে

রবীন্দ্রনাথ নজরুল ইসলামকে সাদর আহ্বান জানিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে গিয়ে থাকতে, ছাত্র-ছাত্রীদের গান শেখাতে এবং নিজে তাঁর "সকল গানের ভাণ্ডারী" দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গান শিখতে। সুরের বিলাসে এহেন নিভৃত জীবন নজরুলের মনঃপুত হয় নি। কারণ, দেশের পরাধীনতা, দেশবাসীর দুঃখদুর্দশা, তাঁর মর্মে দাহ সৃষ্টি করে রেখেছিল, তা থেকে দূরে সরে নিজেরভাবে জীবনযাপন তাঁর মন কিছুতেই সায় দিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ চাইতেন না যে নজরুল রাজনীতিতে নিজেকে অতটা মিশিয়ে দিন—কিন্তু তাঁকে বাধাও দেন্‌নি, তবে তাঁর "তলোয়ার দিয়ে দাঁড়ি চাঁচা" সম্বন্ধে এক সময়ে কৌতুকও করেছিলেন।

নজরুল "ধূমকেতু" প্রকাশ ক'রবার কালে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় যে আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন তা'তে তিনি নজরুলের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার ক'রে নিলেন। দেশবাসীকে জাগাবার, অন্ধকারে অগ্নিসেতু বাঁধবার সেই উদ্যোগকে অভিনন্দন জানালেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বের সাধনা করে চলেছিলেন স্বদেশের পরাধীনতাতে, সামাজিক নানা অবিচারে তিনিও ছিলেন পীড়িত, এ সবের প্রতিকারের প্রয়াস ছিল তাঁর সমগ্র মনুষ্যত্বের সাধনার অন্তর্ভুক্ত। গঠনমূলক কাজের পক্ষে মতপ্রকাশে, তলা থেকে স্বদেশীসমাজ গড়ে তোলার আহ্বানে তাঁর সেই সামগ্রিক, দূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নজরুলের পক্ষে দেশের পরাধীনতা অসহ্য হ'য়ে উঠেছিলো, অত্যাচার ও অবিচারের প্রতিকারে যেন

এক দিনও বিলম্ব সইছিল না। গদ্যে ও পদ্যে তাই তাঁর হাতে বাজলো সেদিন অগ্নিবীণা।

কিন্তু হৃদয়মন যার সুরে বাঁধা সে কি কখনো সুরকে বেঁধে রাখতে পারে? অসীম সুরলোকে উড়ে চলে তার প্রাণ, সুরলোক থেকে পলকে পলকে ঝ'রে পড়ে তার গান। ত্রিশের দশক নজরুলের গানের প্রহর বলা যেতে পারে। অবিরত ব'য়ে চললো গানের নির্ঝর, সঙ্গে সঙ্গে তাতে সুর দেওয়ার পালা। কিন্তু সে দশকের উদ্বোধন হ'লো মর্মান্তিক পুত্রশোকে। দারুণ বসন্তরোগে কবির সাড়ে তিন বছর বয়সের পুত্র বুলবুলের জীবনের কলি ঝরে পড়লো। এই বয়সেই তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিভার—বিশেষত স্মৃতিশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। একান্ত অসময়ে এই মৃত্যুতে তাঁর পিতামাতা, দিদিমা এবং অন্যান্য আত্মীয়বন্ধুদের মনে দারুণ আঘাত লেগেছিলো। কিন্তু নজরুলের মনে এই মৃত্যুর ফল হয় অতি গভীর। আধ্যাত্মিকতার দিকে তাঁর টান ছোট বেলা থেকেই অনেকে লক্ষ্য করেছেন, তাঁর প্রথম দিককার কবিতাতেও তা ফুটে উঠেছে। প্রিয় পুত্রের মৃত্যু তাঁকে নিয়ে গেলো আরও মনের গভীরে, অপ্রত্যক্ষের রহস্য সন্ধানে। তিনি পরিচিত হলেন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত লালগোলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশিষ্ট যোগসাধক শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের সঙ্গে এবং তাঁর নিকট যোগাভ্যাসের শিক্ষা গ্রহণ করলেন। তিনি ধর্মগ্রন্থ পাঠে মন দিলেন ও গেরুয়া কাপড় পরতে লাগলেন। আধ্যাত্মিকতার প্রতি এই প্রবণতা তাঁর কবি ও সাহিত্যিক জীবনে রূপ নিলো জীবনের শাশ্বত অর্থ সন্ধানের ও উদ্ঘাটনের সাধনায়। তারই প্রেরণায় তিনি রচনা করলেন সংখ্যাতীত গান, সুর দিলেন সে সবে, বিভিন্ন

সুরের সংমিশ্রণে নূতন সুর সৃষ্টি করলেন, বহু অপ্রচলিত সুর পুনরুদ্ধার ক'রে গানে সে সব সংযোজন করলেন, আরবী, ফার্সী থেকে সুর এনেও নিজের গানে করলেন প্রয়োগ। পূর্বেই বলা হয়েছে, ছোটবেলা থেকেই নজরুল লেটোর দলের ও অন্যান্যদের জন্য গান লিখতেন। শিয়ারশোল রাজ হাই স্কুলের শিক্ষক শ্রীসতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল তাঁকে উচ্চাঙ্গের সংগীত সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখিয়েছিলেন, একথা আমরা মুজফফর সাহেবের বই ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানতে পারি। আরও জানতে পাই যে ফৌজে থাকা কালেও তার সংগীত চর্চার বিরাম ছিল না। সে সময়েই তিনি অনেক বাজনাও শিক্ষা করেন। ফৌজী বন্ধুদের কেউ কেউ তাঁকে সে বিষয়ে সাহায্যও করেছিলেন। তারপর বিশের দশকের শেষের দিকে তাঁর তিন খানা গানের বই প্রকাশিত হয়। এ কথাও পূর্বেই বলা হ'য়েছে। ১৯৩১ সাল থেকে চার বছরে তাঁর নয় খানা গানের বই প্রকাশ লাভ করে। ১৯৩১ সালে বেরোয় "নজরুল স্বরলিপি" ও "সুরসাকী"। "জুলফিকার" ও "বনগীতি" বেরোয় ১৯৩২ সালে, ১৯৩৩ সালে "গুলবাগিচ" এবং ১৯৩৪ সালে "গীতি শতদল", "সুরলিপি," "সুরমুকুর" এবং "গানের মালা"। জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকাতে বৃটিশ গ্রামোফোন কোম্পানী প্রথমে নজরুলকে এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু যখন তাঁর গান জনপ্রিয় হ'য়ে উঠলো এবং তাঁর গানের রেকর্ডের জন্য জনসাধারণের পক্ষ থেকে দাবী আসতে লাগলো, তখন বাধ্য হয়েই কোম্পানী নজরুলকে সংগীত রচয়িতার ও শিক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ ঐ সময়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রধান সংগীত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, নজরুল তাঁর নিকট

নিজেও গান শেখেন এবং “বনগীতি” বইখানি তাঁকে উৎসর্গ করেন। ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁর মৃত্যুর পর নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রধান সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশনের কলকাতা ষ্টেশনেও তিনি সংগীত রচয়িতার পদ লাভ করেন এবং বেতার স্থচীতে অনেক নূতনত্বের প্রবর্তন করেছিলেন। নিজের উদ্ভাবিত রাগে অনেক গানও তিনি বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করেন। তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের রচিত নাটকের জন্যও তিনি গান লিখে দিতেন, চলচ্চিত্রের জন্যও তাঁকে গান লিখতে হতো। “ধ্রুব” নামে একটি ছায়াচিত্রে তিনি সংগীত পরিচালকের কাজ করেন এবং তাতে নারদের ভূমিকায় নিজে অভিনয়ও করেছিলেন। স্বরচিত “আলেয়া” নাটকের অভিনয়েও তিনি একবার নেমেছিলেন। তাঁর অপ্রকাশিত অনেক গান সংগৃহীত হয়ে ১৯৫২ সালে “বুলবুল”য়ের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

নজরুলের গানের পটভূমি বুঝতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কেউ কেউ বলেছেন, আবেগের প্রাচুর্যে নজরুলের অনেক কবিতা বেশী দীর্ঘ হয়ে পড়েছে, কখনো কখনো লাইন টেনে নিয়ে যাবার ফলে ছন্দের উপরও টান পড়েছে—যদিও কাব্য স্থষমার ব্যাঘাত ঘটেনি। কিন্তু সেই আবেগই তাঁর গানের আবেদন বাড়িয়ে নিয়ে গেছে। ধ্রুপদী থেকে শুরু করে লোকসংগীত—বাউল, ভাটিয়াল, ঝুমুর, ভজন, কীর্তন, রাম-প্রসাদী—সব কিছু তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, এ সবে তাঁর ভাবের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন এবং এ সবের মাধ্যমে নিজের ভাবের ধারা বইয়ে দিয়েছিলেন। বাঙালীর মানসভূমি বিচিত্র স্থরের ধারায় সিক্ত হয়েছে। বাউল দুয়ারে দুয়ারে গান গেয়ে ফেরে, মাঝি ভাটিয়াল গেয়ে নৌকো বেয়ে যায়, কীর্তনে ভক্ত

একান্ত আশ্রয় পায়, ঝুমুরে নাচের তালে তালে দেহ মনের উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ে। মুসলমান ফকীর দরবেশকে দেখা যায় এই বাংলাব নিরালা রাস্তায় মুর্শিদাগানে তারাও খোঁজে চিরদিনের আপন জনকে—নির্জন পল্লীপ্রান্ত হতে কখনো শোনো যায় সুব :

"এক ভবে নিরূপ মানুষ ফেরে
ঝলক দিচ্ছে যার অন্তরে—
কই ভবে ... . "

এরা সবাই প্রবেশ করেছিলো কাজী নজরুল ইসলামেব মনের দুয়োরে। নিজের মনেব মাধুরী মিশায়ে তিনি তাদের নূতন করে সৃষ্টি করেছেন। সংগীতবেত্তারা জানিয়েছেন কেমন করে নজরুলের হাতে সুরের যাদুকবী সার্থক হয়েছে. ভাবের সঙ্গে সংগতিতে অপূর্ব রসলোক সৃষ্টি করেছে। বাঙালীর গান কখনও ভাবছাড়া নয়। নজরুলের গানেও বিচিত্র সুন্দর ভাবলোক রূপ ধরেছে। সে ভাবলোকে প্রথমেই আছে নজরুলের স্বদেশ। স্বদেশের ভাবমূর্তি তাঁর গানেও অধিষ্ঠিত। বিদেশী শক্তির অধীন তখন দেশ—দেশমাতৃকার পরাধীনতার জ্বালায় কবির মর্মদাহী বেদনা। কিন্তু সে সব ছাপিয়ে তাঁর স্বপ্ন :

"স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী।
তুই যেন রাজরাজেশ্বরী।
নবীন ভারত! নবীন ভারত!
স্তব-গান ওঠে ভুবন ভরি॥"

স্বদেশ প্রেমেরও নানাদিক আছে। আমাদের দেশেও তা নানা সমস্যার দ্বারা কণ্টকিত। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে আমাদের

স্বদেশিকতার ভিত্তি; তারই উদ্গাতা নজরুল। এ মর্মে একটি গানের প্রথম চার লাইন এই:

"হিন্দু মুসলমান দুটি ভাই
ভারতের দুই আঁখিতারা।
এক বাগানে দুটি তরু
দেবদারু আর কদম-চারা।"

অসংখ্য প্রেমের কবিতা লিখেছেন নজরুল। প্রকৃতিকে তিনি গভীর, বিচিত্র ও উজ্জ্বলরূপে আবাহন করেছেন। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ, বিচিত্র ভঙ্গিমা তাঁর গানে ধরা পড়েছে, উপযুক্ত সুরে মূর্চ্ছনা জাগিয়েছে, মানুষের মনেও স্থায়ী রূপ নিয়েছে। তাঁর ভক্তিমূলক গান সব সম্প্রদায়, সব ভক্তমণ্ডলী থেকেই উৎসারিত। তিনি রাধাকৃষ্ণলীলার বহু গান রচনা করেছেন; বৈষ্ণবজনচিত্তকে সে সব গান পদাবলী কীর্ত্তন, ভজনের মতোই মুগ্ধ করেছে। এতেই বোঝা যায়, দেশের সব সম্প্রদায়, সব মানুষের সঙ্গে তিনি একাত্মতা লাভ করে-ছিলেন। তাঁর স্বদেশপ্রেম সব ধর্মের, সব সম্প্রদায়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে মানবিকতায় দীপ্ত। আমাদের দেশে এমন ক'রে আর কেউ সর্বলোকের নিগূঢ় সাধনার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে বলে জানা নেই।

নজরুল রচিত ভজন গানের একটির প্রথমাংশ এরূপ:

"চল মন আনন্দধাম।
চল মন আনন্দধাম রে
চল আনন্দধাম॥
লীলা-বিহার প্রেম লোক
নাইরে সেথা দুখ শোক,

সেথা বিহরে চির ব্রজ-বালক
বনশীওয়ালা শ্যাম রে
চল আনন্দধাম"।

আর কীর্তনগানের একটি নমুনা দেওয়া যেতে পারে:

"আমি কি সুখে লো গৃহে র'ব।
আমার শ্যাম হ'ল যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব॥
সে আমারই ধেয়ান করিত গো সদা
তার সে ধ্যান ভাঙ্গিল যদি
ওলো সে ভোলে ভুলুক, আমি ঐ রূপ
ধেয়াইব নিরবধি।
আমি যোগিনী হ'ব॥"

গানটি পরে বহু বিস্তারের মধ্য দিয়ে এসে যতিতে পৌঁছেছে।

ইসলামী সংগীতও নজরুল অনেক লিখেছেন। মানব হিত ও সাম্যের বাণীতেই ইসলামের আদি গৌরব ও সৌন্দর্য নিহিত ছিল, নজরুলের ইসলামী গানেও তাই ধ্বনিত হয়েছে। ইসলামের পুনর্জাগরণের গান তিনি গেয়েছেন, কিন্তু তা কোনো ধর্মীয় পুনর্জাগরণ নয়: প্রথম মহাযুদ্ধের পর মুসলিম দেশসমূহে যে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল, নজরুলের ইসলামী সংগীতে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অগ্নি-পুরুষ জামালউদ্দীন আফগানীর সময় থেকে যে পুনর্জাগরণের প্রেরণা মুসলিম দেশসমূহকে মাতিয়ে তুলেছিল, প্রথম মহাযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যে ধ্বংসের সুযোগে তাই দুর্বার হয়ে ওঠে এবং পাশ্চাত্য ঔপনিবেশিকবাদেরও মোকাবেলা

করে। নজরুল বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে মুসলিম নব-জাগরণকেও দেখেন সারা পৃথিবীর মানবজাতির স্বাধীনতা ও সাম্যের অঙ্গরূপে—ধর্মীয় জাগরণরূপে নয়, এবং সে ভাবেই তাকে অভিনন্দিত করেন। তাঁর প্রথম দিকের ইসলামী সংগীতগুলি "জুলফিকার" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। প্রথম গানটির এ'ভাবে শুরু:

"দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ্ জেগে
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বালা॥
গাজী মুস্তাফা কামালের সাথে
জেগেছে তুর্কী সুর্য্য তাজ,
রেজা পহ্লবী সাথে জাগিয়াছে
বিরাণ মুলুক ইরাণও আজ,
গোলামী বিসরি, জেগেছে মিসরী
জগলুল সাথে প্রাণ মাতাল।"

হিন্দু ও মুসলমান উভয় ভাবধারাকে নজরুল আহ্বান ক'রেছেন ক্ষাত্র বীর্য ও জীবন আত্মোৎসর্গের আদর্শকে সঞ্জীবিত করার জন্য: সেভাবেই তারা জাতীয় জীবনের মূল ধারায় অক্লেশে এসে মিশেছে।

নজরুল বাংলার কাব্য ও সংগীতে গজল গানের প্রবর্তক। বঙ্গভারতীর বীণাতন্ত্রে তিনিই প্রথম তুলেছিলেন গজলের ঝঙ্কার:

"দিতে এলে ফুল, হে প্রিয়,
কে আজি সমাধিতে মোর।

এতদিনে কি আমারে
পড়িল মনে মনোচোর ॥
জীবনে যারে চাহনি
ঘুমাইতে দাও তাহারে,
মরণ-পারে ভেঙ্গোনা
ভেঙ্গোনা তাহার ঘুম ঘোর ॥"

গানটির অবশিষ্টাংশও জাগায় করুণ মূর্চ্ছনা। বাঙ্গালীর প্রাণে গজল এম্‌নি মূর্চ্ছনা তুলেছিল।

নজরুলের মাটির টান সে যেন আকবের টান, শিশুকাল থেকেই মাটির সঙ্গে তাঁর গভীর সংযোগ। কাজেই লোক-সংগীতের সুর শোনামাত্র তিনি তাকে আপন ক'রে নিতে পেরেছেন। বাংলা দেশের সর্বত্রই বিচিত্র লোকসংগীত প্রচলিত আছে। ভাটিয়াল, ভাওয়াই এবং অন্যান্য গানের সুরে পথে-প্রান্তরে লোকচিত্ত উন্মুখ হয়েছে। নজরুল সব ক'টি সুরকেই নিজের গানে গেঁথে নিয়েছেন। বাউল গান বাংলার এক বিশিষ্ট সম্পদ, নজরুল খাঁটি বাউলের সুরে বহু গান রচনা করেছেন। একটি গানের প্রথমার্ধ এরূপ :

"আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল
আমারি এই আপন দেহ।
আমার এ প্রাণের ঠাকুর নহে সুদূর
অন্তরে মন্দির-গেহ ॥
সে থাকে সকল সুখে সকল দুখে
আমার বুকে অহরহ,
কভু তায় প্রনাম করি বক্ষে ধরি
কভু তারে বিলাই স্নেহ ॥"

ভাটিয়াল গান নদী বহুল পূর্ব্ববঙ্গের লোকের নিজস্ব গান: বাস্তুত্যাগী মানুষও যেন তার সুরে ছেড়ে-আসা জন্মভূমিকে ফিরে পায়। নজরুলও অনেক ভাটিয়াল গান রচনা করেছেন। একটির প্রথমাংশ এই :

"ওরে মাঝি ভাই
তুই কি দুখ পেয়ে কূল হারালি
অকূল দরিয়ায়॥
তোর ঘরের রশি ছিঁড়ে যে গেল—
ঘাটের কড়ি নাই,
তুই মাঝ দরিয়ায় ভেসে চলিস
ভাসিযে তরী তাই।
ও ভাই দরিয়ায় আসে জোয়ার ভাটি রে
তোর ঐ চক্ষের পানি চাই।"

এরূপে জেগেছে তাঁর বিচিত্র সুরের ঝঙ্কার। রাজনীতিতে, সমাজে, ধর্মে যে সব অসাধুতা, জুয়াচুরী আছে ব্যঙ্গ কবিতায় ও গানে তিনি তাদের নির্মমভাবে আঘাত করেছেন। সে আঘাত প্রত্যক্ষ, তা সূক্ষ্মতার অপেক্ষা রাখেনি। কিন্তু কবি নজরুলের তীব্র ক্ষোভ ও জ্বালা সে সবে সুস্পষ্ট। নজরুল নিজেও ভালো গাইতে পারতেন। তরুণ তরুণীদের আহ্বানে তিনি অনেক সময়ে সভাসমিতিতে যোগ দিতেন—তাঁর চেহারা, কণ্ঠস্বর সব কিছু মিলে, গানে, আবৃত্তিতে তাদের পাগল করে দিত। এ' সময়টিতে তিনি প্রধানত সুরের রাজ্যেই বিচরণ করতেন। কিন্তু যুবক ও ছাত্রদের সভা বা সাহিত্য সম্মেলনে যখন তাঁর ডাক পড়তো তখন তিনি সাড়া না দিয়ে পারতেন না। দেশের চলন্ত, প্রাণবন্ত জীবনের সঙ্গে

যোগ আর যে-ই হারাক্, নজরুলের পক্ষে তা' হারানো সম্ভব ছিল না। সুরের রাজ্যে বিচরণ করার সময়েও তার পা থাকতো মাটিতে, স্বদেশের মাটিতে। কেননা—

"আমার দেশের মাটি
ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি ॥
এই দেশেরই মাটি জলে
এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই, মিটাই ক্ষুধা
পিয়ে এরি দুধের বাটী ॥"

ষষ্ঠ অধ্যায়

জীবন যখন শুকায়ে যায়

ত্রিশের দশক অতিক্রান্ত হলো। কাজী নজরুলের বয়স তখন সবেমাত্র চল্লিশ পেরিয়েছে। তাঁর জীবনের মধ্যাহ্নেই অন্ধকার নেমে আস্‌বে, আগে এমন কে ভেবেছিলো? তবু নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো জীবন তাঁর আবার জ্বলে উঠলো। এ দশ বছর তিনি সুরলোকে আবদ্ধ ছিলেন, এখন আবার কাব্যে ধরা দিলেন। কিন্তু এ কাব্যের সুর পূর্বাপেক্ষা ভিন্ন— অতীন্দ্রিয় রহস্যলোকের আভাষ ছিল তা'তে। যে রহস্য-লোকের প্রবেশ পথের তিনি এতদিন সন্ধান করছিলেন তাই যেন তাঁর মনে, তাঁর কাব্যে ধরা দিল। সে সব কবিতা ও সে সময়ের অন্য কবিতা সংকলিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালে "নতুন চাঁদ" নামক কাব্যগ্রন্থে: তখন নজরুল আর আত্মস্থ ছিলেন না। বইখানির প্রথম কবিতাটির নামই "নতুন চাঁদ"—ঐক্যের এক দীর্ঘ জয়গাথা। কবি বল্‌ছেন—

চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ!
অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ
বাঁধিবে সকলে এক সাথে গলে গলে
মিলিয়া চলিব তাঁর পথে দলে দলে।
রবে না ধর্ম জাতির ভেদ
রবে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ,
রবে না লোভ, রবে না ক্ষোভ অহঙ্কার
প্রলয় পয়োধি এক নায়ে হইব পার।
একের লীলা এ, দু'জন নাই
তাহারি সৃষ্টি সবাই ভাই,

কতনামে ডাকি—সর্বনাম এক তিনি
তাঁরে চিনিনাক, নিজেরে তাই নাহি চিনি।
আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঘরে এক সমান
সকলের মাঠে শস্য দেয়, ফুল ফোটায়
সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা, করুণা পায়।
প্রলয়ের রূপ ধরে যবে
তার ক্রোধ নেমে আসে ভবে,
সব ধর্মের সব মানব মরে তখন,
থাকেনা হিন্দু মুসলমানের আস্ফালন!
এককে মানিলে রহেনা দুই,
এস সবে সেই এককে ছুঁই,
এক সে স্রষ্টা সব কিছুর, সব জাতির।
আসিছে তাহারি চন্দ্রালোক এক বাতির!
মরিছে যাহারা—তাহারা নয়,
আসিছে—যাহারা বাঁচিয়া রয়,
নিত্য অভেদ উদার প্রাণ নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
আসমানে চাঁদ দেয় আজান নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
মৃত্যুকে তারা করেনা ভ'য় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান,
তাহারা বুদ্ধি-বদ্ধ নয় নৌজোয়ান নৌজোয়ান!

নূতন চাঁদ আস্‌ছে বিধাতার পথ দেখাতে—যে পথে নৌজোয়ানেরা নূতন জগৎ সৃষ্টি ক'রবে—সে জগতে থাক্‌বে না জাতির বা ধর্মের ভেদ, জনগণের মধ্যে কোনো বিবাদ বিভেদ, কোনো লোভ, কোনো খেদ। কবির অন্তরলোকে সে ঐক্য ধরা দিয়েছে। প্রেমের কবিতাও আছে বইটিতে—সে প্রেম এক অনন্ত পিয়াসা, সে চিরসুন্দর মানুষকে বারে বারে

অসুন্দরের পথ থেকে টেনে নিয়ে যায়। কবির বিদ্রোহ এখন নিজেরই সৃষ্ট অসুরের বিরুদ্ধে:

"সেই কুৎসিৎ শ্রীহীন অসুরে তখনি বধিতে চাই,
মোর বিদ্রোহ সাম্য-সৃষ্টি-নাই সেথা ভেদ নাই!
নাই সেথা যশ-তৃষ্ণার লোভ, নাই বিরোধের ক্লেদ,
নাই সেথা মোর হিংসার ভয়, নাই সেথা কোনো ভেদ,
নাই অহিংসা হিংসা সেখানে কেবল পরম শাম,
রাজনীতি নাই, কোনো নীতি নাই,—'অভেদম' তার নাম।"

তারই জন্য তিনি তরুণকে আহ্বান করেছেন: সে আহ্বান অভয়-সুন্দরকে:

"আমি গেলে যারা আমার পতাকা ধরিবে বিপুল বলে
সেই সে অগ্র পথিকের দল এস এস পথ-তলে!
সেদিন মৌন সমাধি মগ্ন ইস্রাফিলের বাশী
বাজিয়া উঠিবে—টুটিবে দেশের তমসা সর্বনাশী।"

রবীন্দ্রনাথের অশীতি-জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লেখা "অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি" কবিতাটিও ঐ বইয়ে রয়েছে। ঐ কবিতাটি গুরুদেবের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত সম্বন্ধের এক চরম আত্ম-নিবেদন। কবি যখন ধূমকেতু হ'য়ে ছুটে চলেছেন তখনও তিনি গুরুদেবেরই বিদ্যুত-ছটা, যে বহ্নি-তরঙ্গ তাঁর মধ্যে উঠেছিলো, রবীন্দ্র পরশে তা' চন্দ্র-জ্যোতি হলো। এরই মধ্যে কবি আবার দুর্মদ যৌবনকে আহ্বান করেছেন: তবু আবার সেই অদেখা প্রীতমের অপেক্ষা করছেন:

"জোহরা সেতারা উঠেছে কি পূবে? জেগে
উঠেছে কি পাখী?
সুরাব্ সুরাহি ভেঙ্গে ফেল সাকী, আর
নিশি নাই বাকী।

আসিবে এবার আমার পরম বন্ধুর বোররাক্ ;
ঐ শোনো পূব-তোরণে তাহার রঙ্গীন নীরব ডাক ।"

তবু এখনও তাঁর বিদ্রোহী আত্মা গর্জে ওঠে। থালা-ঘটি-বাটী বাঁধা দিয়ে কৃষক চলেছে ঈদের নামাজ পড়তে। কবি তাকে বল্‌ছেন—শক্তিহীনের কোনো ঈমান নেই, ঈদ নেই। "শিখা" কবিতাটি ভোটসর্বস্ব রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। যৌবনের অনির্বাণ শিখা কি ঐ ভিক্ষার রাজনীতির সাম্‌নে ম্লান হ'য়ে থাকবে? মুসলমানও তখন ভোটের রাজনীতিতে নেমেছে। ভোটের ভিখারী নেতারা তরুণদের গোলাম বানাচ্ছে। কিন্তু যে আজাদ নয়, যে ভাইবোনদের সেবাতে আত্মোৎসর্গ করে না—সে মুসলমান নয়। যুগের আহ্বানে নজরুলের প্রতিভা শেষবারের মতো সাড়া দিয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে অসীমের অনন্তলোক তাঁকে হাত ছানি দিচ্ছে। "নতুন চাঁদ" মোহাম্মদী বুক এজেন্সী থেকে মোঃ ছদরুল আনাম খাঁ কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক লিখছেন—

"বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলাম আজ রোগ শয্যায়। প্রতিভার দীপ্ত-সূর্য, ব্যাধির কালমেঘে আচ্ছন্ন। ......কবির লেখা সর্বশেষ কবিতা গ্রন্থ 'নতুন চাঁদ' তাঁর রোগাক্রান্ত হওয়ার অনতিপূর্বে লিখিত কবিতাগুলির সঞ্চয়ণ। 'নতুন চাঁদ'এর পর তাঁর আর কোনো গ্রন্থ অচিরে প্রকাশিত হবে ব'লে আশা করা যায় না। তাই এই যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেও নজরুল-কাব্য পিপাসুদের হাতে 'নতুন চাঁদ' বহু আয়াস স্বীকার ক'রেও আনন্দের সাথে তুলে দিলাম। 'নতুন চাঁদ' বাংলার জরাগ্রস্ত জীবনে নতুন আনন্দ ও আশার বাণী ধ্বনিত করুক এই কামনা করি।"

এরপর নজরুল ইসলামের বই প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে : নাম "সঞ্চয়ণ"—শিশুদের মনমাতানো কবিতা সমষ্টি। "মরু-ভাস্কর"—হজরত মোহাম্মদের জীবনী ও মহত্ত্বের কাব্যগাথা, ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় "শেষ সওগাত"—কবির অপ্রকাশিত কবিতার সংগ্রহ— দেশাত্মবোধক কবিতা আছে তার মধ্যে, আছে রসরচনা—বৈচিত্র্যের শেষ সমারোহ। এ বইয়ে সংকলিত কয়েকটি কবিতার ছন্দের গাঁথনি লক্ষ্য করবার মতো। পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে একটি গান এবং "কাবেরী তীরে" নামে একটি গাথা ঐ বইয়ের বিশিষ্ট সম্পদ। "ঝড়" নাম দিয়ে আরেকটি সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। "উঠিয়াছে ঝড়" কবিতাটি তাতে রয়েছে। এ বইয়ের বৈশিষ্ট আরবী ছন্দে লিখিত কয়েকটি কবিতা। ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে গানের বই "বুলবুল"য়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হ'য়েছিল। "ধূমকেতু" পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের যে কয়টা পাওয়া গিয়েছিল তাই নিয়ে "ধূম-কেতু" নামে প্রবন্ধ সংকলন বেরোয় ১৯৫২ সালে। মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে কবি নজরুলের সক্রিয় জীবনের অবসান। তারই মধ্যে দেশ তাঁর নিকট থেকে পেলো একুশটি কাব্যগ্রন্থ, গানের বই চৌদ্দটি, ছ'য়টি উপন্যাস ও ছোটগল্প সংগ্রহ, প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য-রচনার বই চারখানা, তিনটি নাটক, শিশুদের জন্য লেখা আরেকটি নাটক, শিশুদের কবিতার বই তিনটি এবং ফার্সী থেকে তিনটি অনুবাদগ্রন্থ। তারপর অস্ফুট রইলো বিরাট ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। কিন্তু কবির কিছু কিছু অপ্রকাশিত রচনা এখনও আবিষ্কৃত হ'য়ে পাঠকজনের নিকট এসে পৌঁছুচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে "দেবীস্তুতি"। সুগায়ক নিতাই ঘটক কর্তৃক সংকলিত কবির

তিনটি অপ্রকাশিত রচনা ও ষোলখানি মাতৃস্তুতির সংগ্রহ। "বিজয়া" ও "হরপ্রিয়া" নামে দুটি অপ্রকাশিত নাটিকাও "দেবীস্তুতি"র অন্তর্ভুক্ত। "দেবীস্তুতি" প্রস্তাবনার গদ্যাংশে কবি আদ্যাশক্তির তিনটি বিভূতি বর্ণনা ক'রেছেন: মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। পণ্ডিতবর্গের মতে শক্তিতত্ত্বের মর্মকথা বইটিতে গানে ও গদ্যে অপূর্বরূপে উদ্ঘাটিত হ'য়েছে। "বিজয়া" নাটিকাতে কবি মাতৃমন্দিরে সকলের সাম্য প্রতিষ্ঠার বন্দনাগান করেছেন। তাঁর সাম্যসাধনা মাতৃপূজায় গিয়ে মিশেছে। এতদিন পর কবি নজরুল রচিত এই শাক্ত-পদাবলীর প্রকাশ ভক্ত ও রসিকজনকে চমৎকৃত করেছে। কবির গানের স্বরলিপির বইও একের পর এক প্রকাশিত হ'য়ে চলেছে।

ঘনিয়ে আসছিল নিষ্ঠুর নিয়তি। ১৯৪১ সালের প্রথম দিকে নজরুলের কয়েকটি ভাষণে বেজে উঠলো এক অনির্দিষ্ট বিদায়ের সুর। কী যেন এক রহস্য ছিল তার মধ্যে— যেন তিনি মনের অতল তলায় তলিয়ে যাচ্ছিলেন। এখন অনেকে মনে করে, যে কাল ব্যাধি তার মস্তিষ্ককে কুরে' কুরে, খাচ্ছিল, তারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি মনের কোণে স'রে যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই সময়েই তিনি বিশেষভাবে যৌগিক প্রক্রিয়ার চর্চা শুরু করেন। তাঁর ক্রমাত্মবিস্মৃতি তারই ফলে ঘটেছে, এমন হওয়া কি অসম্ভব? কে জানে! ১৯৪১ সালের ১৬ই মার্চ্চ তিনি গিয়েছিলেন চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত মহকুমা শহর বনগ্রামে এক সাহিত্য-সভায় যোগ দিতে। সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন: "এই মিষ্টিসিজিম বা মিষ্ট্রির মাঝে যে মিষ্টি, যে মধু পেয়েছি, তা'তে আজ আমার বাণী কেবল 'মধুরম্ মধুরম্ মধুরম্'। এই মধুরম্‌কে প্রকাশের

ভাব, ভঙ্গী, ভাষা এখন আমার চির মধুরের ইচ্ছাধীন। আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া, পাওয়া জীবন, মরণ তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি"। একই সুর বেজে উঠল সে বছরের এপ্রিল মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে। তাতেও তিনি ছিলেন সভাপতি। তিনি বল্‌লেন—"যদি আর বাঁশী না বাজে—আমি কবি বলে বল্‌ছিনে—আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বল্‌ছি—আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন, আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হ'তে আসিনি, আমি নেতা হ'তে আসিনি—আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম"।

যা হোক্, তখনো সব শেষ হয়ে যায়নি। ১৯৪১ সালের ২৫শে মে তারিখে এক জনসভায় তাঁর তেতাল্লিশতম জন্মদিবস পালিত হয়। তার অল্পদিন পরই ৭ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটে। সে উপলক্ষে নজরুল কয়েকটি কবিতা রচনা করেন: কল্‌কাতা বেতার কেন্দ্র থেকে তার একটি তিনি পড়ে শোনান। সে বছর অক্টোবর মাসে এলো তাঁর নিকট আবার রাজনৈতিক সাংবাদিকতার আহ্বান। মুসলিম লীগ প্রচারিত দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রতিরোধ করার জন্য এ, কে, ফজলুল হক সাহেব পুনরায় "নবযুগ" পত্রিকা প্রকাশ করেন, নজরুল হন্ সম্পাদক। দেশের ও জাতির প্রতি কর্তব্য করবার এই সুযোগ তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন, পরে সেই তাঁর শেষ সুযোগ বলে প্রমাণিত হলো।

দেশ যেন তাঁকে ফিরে আহ্বান জানালো, কবিতাতেও তিনি তা লিখলেন। এ সময়ের একটি কবিতার প্রথম দু'লাইন:

"বন্ধুর পথে চলিব আবার, বন্ধুরা এসো ফিরে
সেই আগেকার নিত্য শুদ্ধ প্রাণ-প্রবাহের তীরে।"
কবিতাটি "শেষ সওগাত"য়ে মুদ্রিত হয়েছে।

১৯৪২ সলের ফেব্রুয়ারীতে চীন গভর্ণমেণ্টের তদানীন্তন প্রধান মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক ও মাদাম চিয়াং-কাই-শেক ভারতে আসেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর অনুরোধে নজরুল তাঁদের সম্বর্ধনা জানিয়ে গান রচনা করেন। প্রথম দু'লাইন এরূপ:

"চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক,
চীন ভারতের জয় হোক্! ঐক্যের জয় হোক্!
সাম্যের জয় হোক্!"

ঐ সময়েই তাঁর হৃদয়-মন ঘিরে বিস্মৃতি নেমে আসছিল: তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজী সব্যসাচীর বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে তা জানা যায়। সব্যসাচী জানাচ্ছেন: ১৯৪২ সালে যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং কলকাতায় নিষ্প্রদীপ চল্‌ছে, তখন এক সন্ধ্যাবেলায় তাঁর পিতা বাসা থেকে বেরিয়ে যান্। সে সময়ে তাঁদের বাসা ছিল উত্তর কল্‌কাতার অন্তর্গত শ্যামবাজারে। সে সময়েই নজরুল যৌগিক প্রক্রিয়ায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, তিনি আধ্যাত্মসন্ধানে ব্যাপৃত বলে বোধ হতো। নজরুল সে রাত্রে ফিরলেন না। বিষম চিন্তিত হ'য়ে সব্যসাচী ও তাঁর ছোট ভাই অনিরুদ্ধ পিতাকে খুঁজতে বেরোলেন, তাঁদের সঙ্গে গেলেন পিতৃবন্ধু শ্রীকালীপদ গুহ রায়। শ্রীগুহরায় পরে বারাণসীতে সন্ন্যাস জীবন যাপন

করেন, কিছুদিন পূর্বে তাঁর দেহান্ত ঘটেছে। তাঁরা নজরুলের কোনো সন্ধান পেলেন না। কিন্তু পরদিন থানা থেকে খবর এলো যে নজরুলকে শহরতলী অঞ্চল কামারহাটিতে পাওয়া গিয়েছে এবং তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে রাখা হয়েছে। সব্য-সাচীরা তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে স্থানীয় লোকদের কাছে জানতে পান যে নজরুল বোধহয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে এসে বি, টি, রোড দিয়ে আপন মনে হাঁটছিলেন, অন্যদিকে তাঁর কোন খেয়াল ছিলনা, বড় বড় সামরিক ট্রাক তাঁর গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছিল। স্থানীয় লোকেরা তাঁকে এ ভাবে দেখেতে পেয়ে তাঁর নিরাপত্তার জন্য তাঁকে রাস্তা থেকে টেনে নিয়ে স্থানীয় হাসপাতালে রাখার ব্যবস্থা করে।

১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই রাত্রে এলো অদৃষ্টের চরম আঘাত। নজরুল কলকাতা বেতার কেন্দ্রে প্রোগ্রাম পরি-চালনা করছিলেন; এমন সময়ে তাঁর জিহ্বা অসাড় হ'য়ে গেলো, তিনি আর কথা বলতে পারলেন না। গভীর বিপর্যয় নেমে এলো তাঁর দেহমনে। নজরুলকে বাড়া নিয়ে যাওয়া হ'লো; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁর মস্তিষ্কও আর কার্যকরী রইলো না। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁর চিকিৎসার ভার নিলেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী তখন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী; তাঁরও সাহায্য বিশেষভাবে পাওয়া গেলো। নজরুল বায়ু পরিবর্তনের জন্য মধুপুরে প্রেরিত হলেন; কিন্তু তাতে বিশেষ ফল হলো না। চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্য ডক্টর মুখার্জীর নেতৃত্বে এক কমিটি গঠিত হয়; কলকাতার লুম্বিনী পার্কে অবস্থিত মানসিক হাসপাতালে নজরুলকে ভর্তিও করা হয়, কিন্তু চিকিৎসায় কোনো কাজ

হয় না। জুলফিকার হায়দার নামে জনৈক সাহিত্যসেবী এই কমিটীর এক প্রধান কর্মী ছিলেন। তারপর দেশ ডুবে গেলো সাম্প্রদায়িক বিবাদের আবর্তে, রাজনীতি গতি নিলো দেশ বিভাগের দিকে, স্বাধীনতার সঙ্গে এলো বিভাগ। এই কয়-বৎসর অসুস্থ কবির চিকিৎসার জন্য কোনো সুসংগঠিত প্রচেষ্টা সম্ভব হয়নি। ১৯৫২ সালের জুন মাসে নজরুল নিরাময় সমিতি গঠিত হয়। রাঁচীর মানসিক হাসপাতালে চার মাস চিকিৎসা হয়; তারপর কবি ও কবিপত্নীকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হয়, ১৯৫৩ সালের ১০ই মে তারিখে তাঁরা কলকাতা থেকে যাত্রা করেন। কবির রোগের হেতু নির্ণয়ে লণ্ডন ও ভিয়েনার বিশেষজ্ঞদের ভেতর মতভেদ ঘটে; কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা একমত হন যে রোগের প্রথম দিকে চিকিৎসায় দারুণ অবহেলা ঘটেছে এবং এখন আর আরোগ্য লাভের আশা করা যায় না। সোভিয়েট বিশেষজ্ঞদের রোগের বিবরণ আদ্যোপ্রান্ত জানানো হয়, তাঁরাও একই মত প্রকাশ করেন। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে কবি ও কবিপত্নীকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হ'লো। তখন থেকে তিনি পুত্রদের সঙ্গে বাস করছেন। জ্যেষ্ঠ কাজী সব্যসাচী সুপরিচিত শিল্পী—অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবৃত্তিকার ব'লে পরিচিত। কনিষ্ঠ কাজী অনিরুদ্ধ গীটার শিল্পী ও শিক্ষকরূপে বিশেষ সমাদৃত। তাঁদের মাতা প্রমীলা নজরুল ১৯৬২ সালের মে মাসে প্রাণত্যাগ করেছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি কবি নজরুলকে "পদ্মভূষণ" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য নজরুলকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মূল্যবান জগত্তারিনী পদক দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট তাঁকে দু'শ টাকা মাসিক বৃত্তি দিচ্ছিলেন, বর্তমানে তা বাড়িয়ে

তিনশ করা হয়েছে। তাঁর একটি স্থায়ী বাসস্থান নির্মাণের জন্য সরকার একখণ্ড জমি মঞ্জুর করেছেন। পূর্ব পাকিস্তান গভর্ণমেণ্ট তাঁকে সাড়ে তিন শত টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়ে থাকেন। নজরুল আত্মবিস্মৃত, স্তব্ধ; কিন্তু বাইরে তাঁর কোনো বিক্ষোভের প্রকাশ নেই। এত আপন, এত কাছে ছিলেন যিনি—নিকটে থেকেও তিনি দূরে স'রে গেছেন। তবু দেশবাসী তাঁকে শাশ্বতরূপে পেয়েছে তাঁর কবিতায়, তাঁর গানে—তা'তে তাদের চিরকালের উদ্দীপনা, প্রেরণা, আনন্দ, আশ্রয়। মানুষ নজরুল আজ জীবন্মৃত, কবি নজরুলের মৃত্যু নেই॥

সপ্তম অধ্যায়

জনগণের কবি

এক একজন কবি আছেন যাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে আপেক্ষিক নির্জনতায়, লোকসমাজ থেকে দূরে নিভৃত নিরালায়। নজরুল ঠিক সে ধরণের কবি নন। অবশ্য তিনিও ক্ষণে ক্ষণে আপন মনে থেকেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে দেখে এমন কখনও কারু মনে হয়নি যে তাঁর সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশের জন্য একান্তে থাকার প্রয়োজন ছিল। বাস্তবে দেখা গেছে, সাংবাদিকতার কাজে ব্যস্ত থাকার কালেই তাঁর বহু গভীর অর্থপূর্ণ কবিতা লিখিত হয়েছে। প্রাণপ্রাচুর্যে তিনি ছিলেন সদাই উচ্ছল, সদাই চঞ্চল—বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করতে, যাকে বলে গুলতানি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাই চালাতে তাঁর কখনও আগ্রহের অভাব ছিলনা। তারই মধ্যে দেখা যেতো তিনি যেন ইচ্ছা করলেই কবিতা ও গান লিখছেন। লিখবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন হ'লেই একটু আড়ালে গিয়ে চা খেতে খেতে বা পান চিবোতে চিবোতে লিখতেন। দেখা যেতো মনোরম গান বা কবিতা তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে। গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল রুমে, সংবাদপত্রের অফিসে, নিজের বা কোনো বন্ধুর বাড়ীতে, নজরুল যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁর উচ্চকণ্ঠের কথা ও দিলদরিয়া হাসিতে সে জায়গা মুখর হ'য়ে উঠতো। বোধ হ'তো যে প্রাণের প্রস্রবণ তাঁর মধ্যে জোর বয়ে চলেছে এবং অক্লেশে কবিতা বা গান হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌ছে। প্রাণের এই যে উচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ততা—মনে হ'তো এ তাঁর অন্তর জীবনের সঙ্গে বাইরের ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ মিলন থেকেই উৎসারিত। এর মূল কোথায় ভেবে দেখলে সহজেই

মনে হ'বে, বিভিন্ন ভাবনা, ধ্যানধারনার ধারা নজরুলের মনে এসে স্বাভাবিক ভাবে মিলেছিল বলেই এ সম্ভব হয়েছিল। বিভিন্ন ভাবনা, ধ্যান ধারণার ধারা বাঙ্গালীর জীবনে প্রবাহিত রয়েছে—তার ভাবপ্রবণতাকে পুষ্ট করেছে। পণ্ডিতেরা বলে থাকেন, বাংলার পলিমাটি থেকে ঐ ভাবপ্রবণতার জন্ম। আধুনিক বাংলা গ'ড়ে উঠেছে বহু ধার্মিক ও সামাজিক ভাবধারা থেকে, বাইরে থেকে মনে হয়েছে তাদের মধ্যে দ্বন্দও প্রচুর, কিন্তু পরিনামে তাদের সহাবস্থানে বাধা ঘটেনি। ইসলাম এসেছিল সাম্যের আবেদন নিয়ে, তথাকথিত অনুন্নত জাতিদের লক্ষ লক্ষ লোককে আশ্রয় দিয়েছিল। হিন্দুধর্ম আচার সর্বস্ব জাতিভেদের মধ্যে বাসা বেধেছিল, শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম তারই বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ। প্রেমের বাণে তাই সব সামাজিক ভেদ ধুয়ে নিতে চাইলো। তারই ফলে বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী গান বাঙ্গালীর জীবনে এক অভিনব কাব্য-মূর্চ্ছনা। আরে'ক ধারা কালী সাধনায় শক্তির উপাসনা। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাকে সমাজ জীবনে জাগিয়ে তোলার নির্দেশ দিলেন, স্বামী বিবেকানন্দ তাকে জীবপ্রেম ঈশ্বর-প্রেমের সমাজদর্শনে রূপান্তরিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিরীক্ষণ করলেন স্বদেশে মাতৃমূর্ত্তি। দেশপ্রেম বাঙ্গালী জীবনে নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত করলো। রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে তা একই সঙ্গে আন্দোলন ও বিপ্লবাত্মক রূপ নিলো। বিপ্লবান্দোলন স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হলো আবার বিশ ও ত্রিশ দশকের গণ আন্দোলনের সমতালে চললো। ভারতীয় জাতীয়তাবাদে পারস্পরিক সমঝোতা খুঁজে পেলো। বাঙ্গালীর ভাবপ্রবাহের এই ছিল রাজনৈতিক রূপ।

কিন্তু অন্তঃসলিলা নদীর মতো তাঁর লোকজীবন রাজনীতি

থেকে দূরে সাংস্কৃতিক প্রকাশ লাভ করেছিলো। সেখানেও বৈচিত্র কম নয়। পূর্ববঙ্গের ভাটিয়াল, পশ্চিমবঙ্গের ঝুমুর, উভয় বঙ্গে বাউল, গরাণহাটি, রেনেটি কীর্ত্তন, আরও নানা লোকগীতি বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে এসে মিশেছে—রাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা, চৈতন্য প্রেমকথা—এমনি আরও ভাবলীলা প্রসঙ্গে বাঙ্গালীর মনকে সিক্ত করেছে। সুফীদের ভাবসাধনা এনেছে তাতে নূতন সম্পদ। মুসলিম ভক্ত ও ফকীরেরা মুর্শিদা ও অন্যান্য গান রচনা করেছেন সব ঃ মানুষের মনকেই সে গান গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

"কয়রে মদন, মরি আমি খেদে
তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে"

যশোহরের লালন শাহ্ ফকীর ছিলেন এম্‌নি এক মহৎ সাধক ঃ বিধাতাকে সন্ধান কর্‌ছে মানুষ, বিধাতাই তার দয়িত ঃ

"ওরে নিঠুর দরদী
তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে,
তুই ফুল ফোটাবি, বাস ছোটাবি সবুর বি
দেখ্‌না আমার পরম গুরু সাঁই,
যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই

"হৃদয়কমল ফুট্‌ছে যুগ যুগ ধরে ঃ তা'তে আমিও বাঁধা, তুমিও বাঁধা ঃ মুক্তি কোথাও নেই"। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন লালন শাহ্ ফকীরের কথা ঃ বলেছিলেন—লোকসাধনা, লোক-সংগীতের মাধ্যমে আমাদের জনগণেরও চলেছে চিরকাল দার্শনিক তত্ত্বসন্ধান।

এই বিচিত্র ধারাতে যুগ যুগ ধরে বাঙ্গালীর ভাবলোক গড়ে উঠেছে। অত্যাধুনিক যুগে তাতে লেগেছে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার প্রেরণা—বাস্তবে জেগেছে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। তার ফলে তার বুদ্ধিবৃত্তিতে জেগেছে উন্মাদনা, সব সময়ে তাতে স্থৈর্য বজায় থাকেনি, কখনো কখনো অশান্তিতেও ক্ষুব্ধ হয়েছে। বাঙ্গালীর এই মানসলোক বাক্যে ও কর্মে সর্বতোমুখী প্রকাশ লাভ করেছে।

সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটেছে নজরুল ইসলামে ঃ তেমন আর কারুতে নয়। নজরুল প্রগাঢ় বিদ্যার অধিকারি হন্‌নি, বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও রয়েছে সীমিত। কিন্তু বাঙ্গালী জীবনের সমস্ত ভাবতরঙ্গ তাঁর মনে পৌঁছেছে—তাদের তরঙ্গভঙ্গ, তাদের রূপবৈচিত্র্য, তাদের আবেদনকে তিনি ভাষা দিয়েছেন। কী ক'রে যে তিনি দেশের জীবনের ধার্মিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সব রকম ভাববৈচিত্রকে নিজ সত্তায় নিতে পেরেছিলেন, সে ইতিহাস অপ্রত্যক্ষ। শুধু দেখা যায়, তীব্র ভাবাবেগ তাঁকে পরিচালিত করেছে—তাঁর কবিতাতেও মুক্ত বল্গাহীন হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে কোনো কোনো কবিতা অযথা দীর্ঘায়িত হয়েছে, কোনো কোনোটাতে সংহত মাধুর্যের অভাব ঘটেছে। জীবনের তিনি করেছেন প্রত্যক্ষ মোকাবিলা, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ঘটেছে তাঁর তা'তে : আত্মহারা হয়ে তাকে গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে ভাবাবেগই প্রাধান্য পেয়েছে ঃ ক্ষণে ক্ষণে তাতে ফুটেছে প্রশান্ত গরিমা।

সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে নজরুলকে কোনো বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা চলে না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের অবসান হয়, সে হিসেবে তাঁকে কবি গুরুর

সমসাময়িক বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বাঙ্গালী সাহিত্যিক মাত্রেই তাঁদের ভাবনায় ও প্রকাশ ভঙ্গীতে তাঁর দ্বারা কমবেশী প্রভাবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিতায় বিদ্রোহের সুর, তাঁর সৃষ্টিতে আবেগ প্রাধান্য এবং নূতন সুর উদ্ভাবনে ও সংযোজনে তাঁর অপার কৃতিত্ব তাঁকে এক অনুপম স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তারপর "কল্লোল" যুগ এল আধুনিকতার দাবী নিয়েঃ সে যুগের কবি ও কথাশিল্পীরা ঘোষনা করলেন, নিষেধের বন্ধন থেকে যৌনবিষয়ক লেখার মুক্তি এবং পতিত, অবমানিত মানুষের জন্য দরদ। নজরুলকেও সেই গোষ্ঠীতে ফেলা হয়েছিলঃ এমন কি রবীন্দ্রনাথ যখন এই দরদকে ভাণমাত্র মনে করে দারিদ্র্যের আস্ফালন বলে অভিহিত করেন তখন নজরুল প্রতিবাদও জানান, আর প্রতিবাদ জানান তখন যখন কবিগুরু বাংলায় আরবী ফার্সী শব্দের অত্যধিক ব্যবহারের সমালোচনা করেন। রক্ত অর্থে "খুন" শব্দের ব্যবহার নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের মতভেদ ঘটেছিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও নজরুলকে কোনো সাহিত্যিক মতবাদ বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মনে করা যেতোনা। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরনা থেকে তিনি গান বা কবিতা লিখ্‌তেনঃ যা লিখ্‌তেন তাই পাঠক সাধারণের নিকট পৌঁছে যে'তোঃ সে লেখা সেকেলে বা আধুনিক সে সব বিচারের অবকাশ ছিল্‌না। কোনো বিশেষ শ্রেণীতে তাঁকে ফেলার প্রয়োজন হতো না, তা সম্ভবও ছিলনা। দেশের মানুষের সঙ্গে তাঁর ভাববিনিময় স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং সোচ্চারঃ তার কোনো ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যাকারের প্রয়োজন ছিলনা। তরুণদের উপর তাঁর প্রভাব ছিল সম্মোহনকর। অনুপ্রাশ ইত্যাদির সাহায্যে তাঁর কবিতার ছন্দঝঙ্কার মনোরম হয়ে উঠতো। শিশুদের জন্য তিনি অনেক কবিতা লিখেছেনঃ

সে সব তাদের কল্পনাকে রাঙ্গিয়ে তুলেছে, তাদের মুখে মুখে ফিরেছে। কল্পনাকে শুধু রাঙ্গানো নয়, তার মধ্যে বড়ো হ'বার আদর্শকেও তুলে ধরেছে। কবিতা ও গানের সব পর্যায়ে নজরুলের সার্থক আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। তাঁর রচিত ছোট গল্পে ও উপন্যাসে প্রেম ও অন্যান্য হৃদয়াবেগের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রয়েছে। মানুষের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে তাতে: কিন্তু মানবিক সম্বন্ধের যে কার্যকারণ ভিত্তিক জটিল ওঠা পড়া নিয়ে কথা সাহিত্যের কারবার, তা তা'তে তেমন করে ফোটেনি, বরং কয়েকটিতে রাজনীতিই বেশী ফুটেছে। বৈপ্লবিক আদর্শবাদ, সামাজিক বৈষম্যের দরুণ প্রেমের লাঞ্ছনা, জীবনের এ কয়েকটি দিকই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর স্বাভাবিক সাহিত্যিক জীবন বজায় থাকলে গল্প ও উপন্যাস রচনায় তাঁর পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যেতো কিনা সে জল্পনা করে আজ আর কোনো লাভ নেই। তিনি ছুটি তিন অঙ্কের ও চারটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন। সেগুলিতে অনেকটা ব্যাপক ধরণের রোমান্স আছে, স্বদেশপ্রেম তাতেও ফুটেছে—তবু সমালোচকদের মতে সে সব প্রকৃত নাটকে উৎরায়নি। ফার্সী থেকে নজরুল হাফিজ ও ওমর খৈয়ামের সার্থক অনুবাদ করেছেন। পবিত্র কোরান অনুবাদের কাজেও তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু শুধু আমপারা নামে অধ্যায়টি অনুবাদ করতে পেরেছেন এবং তা সফল অনুবাদ বলেই গৃহীত হয়েছে। প্রাবন্ধিকরূপে নজরুলকে দেখা গেছে প্রাণবন্ত ভঙ্গীতে ও ভাষায় সমসাময়িক সমস্যাতে সাড়া দিতে। তারও মধ্যে আবেগ ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যরচনা সমসাময়িক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে

ছিলো। তাদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্যও যথেষ্ট। সাংবাদিক জীবনে তিনি এমনিতরো প্রবন্ধ ও রচনা লিখতেন। তা'ছাড়া সম্পাদকরূপে তাঁর সমসাময়িক সমস্ত ঘটনাতে তীব্র আগ্রহ ফুটে উঠ্‌তো: তাদের থেকে দূরে, বিচ্ছিন্ন থাকার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। কোন্ সংবাদের কতটা গুরুত্ব তা তিনি চকিতে অনুভব করতেন, যে সংবাদে কৌতুক বোধ করতেন তাতে কৌতুক প্রকাশ করতেও জানতেন। এ' সব বিচার করলে এই সামগ্রিক সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে নিজের সাহিত্যিক জীবন গড়ে তুলতে বা তাতেই মনোনিবেশ করতে নজরুল কখনো সচেতনভাবে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল তিনি যাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন ও বেঁচে আছেন, নিজের স্বভাবজ প্রতিভার সাহায্যে তাদের সুখদুঃখ, আনন্দ, উদ্বেগ, জীবনসংগ্রাম কে প্রকাশের অলোতে নিয়ে আসা। তাদের সঙ্গে তিনি হৃদয় মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করেছিলেন। সুর, ছন্দ ও কথার মাধ্যমে নজরুল পৌঁছেছেন জনগণ হৃদয়ে—সেখানেই চিরকাল তাঁর স্থিতি।

অষ্টম অধ্যায়

অনন্ত যাত্রী

বেঁচে আছেন নজরুল ইসলাম ঃ কিন্তু পঁচিশ বৎসরের বেশী গত হ'লো, তাঁর দিন ফুরিয়ে গেছে। মর্মান্তিক সত্য এ তবু সত্য। এখন তবে পিছনে তাকাতে পারা যায়, তাঁর জীবন ও বাণীকে সমগ্রভাবে চিন্তা করা যায়—সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে তাঁর কী স্থান নির্দিষ্ট হবে তা অনুমান করা যায়। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের সফল সমাপ্তি ঘটেছে, এখন নজরুল দেশবাসীর সামনে রয়েছেন রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহের বাণীমূর্তিরূপে। "বিদ্রোহী" কবিতাতে নজরুল মানুষকে সার্বভৌম ঘোষণা করেছেন ঃ সে মানুষ একাধারে বাঁশী ও অসি হাতে বিশ্বের মোকাবিলা করছে। পৃথিবীর বুক হতে অবিচার ও অত্যাচার মুছে না যাওয়া পর্যন্ত তার বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই। সত্যিকার মানুষ যে নয় সে স্বাধীনও নয়—মনুষ্যত্ব ও স্বাধীনতা তাই সমার্থক। তাই মানুষ ও তার বিদ্রোহের বাণী চিরন্তন। তাই এখন যারা বড়ো হয়ে উঠ্‌ছে, স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত আগে থেকে বা তারপরে যারা পৃথিবীর আলোতে গড়ে উঠেছে, নজরুল তাদেরও পরমপ্রিয় কবি। বিদ্রোহী হলেও নজরুল নৈরাজ্যবাদী নন। পরিণামে ন্যায়ের জয়ে তিনি আস্থাবান, কাজেই তাঁর বিশ্বাসে নৈরাজ্যবাদী দর্শনের স্থান নেই। স্বাধীনতা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হবে, তারজন্য সংগ্রাম করতে হবে, লক্ষ্য লাভ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম চলবে না, এই তাঁর সহজ ও স্পষ্ট বিশ্বাস ঃ তাঁর রাজনৈতিক জীবনদর্শনও এতেই নিহিত। তাঁর গান ও কবিতা দেশবাসীর নিকট এই জীবনদর্শন ব'য়ে নিয়ে গেছে, বাস্তব জীবনক্ষেত্রে

সবাইকে প্রেরণা যুগিয়েছে। সে প্রেরণা নিত্যই নূতনভাবে মানুষকে সঞ্জীবিত করেছে। বাঙ্গালীর চিন্তা ভাবনা নজরুল ইসলামে স্থায়ী ও পূর্ণরূপে মূর্ত, তিনি সে চিন্তাভাবনার পূর্ণ ও শাশ্বত প্রতীক। বাঙ্গালী জীবন ও সংস্কৃতির সব ধারা এসে মিশেছে তাঁতে, তাঁর সৃষ্টিতে উপযুক্ত প্রকাশ লাভ করেছে। মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যখন দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করা হয় তখন তার পক্ষে এই যুক্তিও দেওয়া হয়েছিল যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদ বর্তমান। কিন্তু বাংলা দেশে এ যুক্তি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা সাহিত্যের নিজস্ব বিকাশ ঘট্‌ছে এবং তাকে এক বিশেষ ধর্ম ভিত্তিক রূপ দেবার চেষ্টাও হয়েছে, দীর্ঘ ব্যবহৃত বাংলা শব্দের স্থলে আরবী ফার্সী শব্দ প্রবর্তনেই সে চেষ্টা রূপ নিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে রবীন্দ্রানুরাগ থেকে সরিয়ে আনা ও তাঁকে নিছক বিদেশী কবি বলে দেখানো সে চেষ্টার অন্য এক দিক। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের গতিপ্রকৃতিতে কোনো পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায় নি ঃ বরং শিল্পে, কবিতায়, নাটকে, গল্পরচনায় একই রকম আধুনিক ভাব ধারা লক্ষ্য করা যায়। পার্থক্য শুধু ফুটেছে মুসলিম পরিবারে ও পরিবেশে ব্যবহৃত কিছু শব্দের সাহিত্যে স্থান লাভে ঃ কিন্তু এমনতরো পার্থক্য বিভেদ সৃষ্টি করেনা—শব্দ সংযোজন করে ও প্রাসঙ্গিক পরিবেশ ফুটিয়ে তুলে সাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটায়। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিভেদ প্রচার করা হয়েছে ও হচ্ছে বটে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এমন কোনো সত্যিকার সাহিত্য গড়ে ওঠেনি যাতে সে বিভেদ প্রমাণিত হয়। নজরুল ইসলামের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে গোঁড়া মুসলমানেরা

তাঁকে স্বধর্মচ্যুত মনে ক'রে সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু যখন তাঁর বিপুল কৃতিত্ব ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো তখন মুসলমান সমাজ তাঁর গৌরবে গৌরব দাবী করলেন এবং তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের নবজাগরণের অন্যতম উদ্গাতা বলে স্বীকৃতি পেলেন। বাঙ্গালীর জীবন ও সংস্কৃতির ঐক্যের বাণীমূর্তিরূপে নজরুলের যে ঐতিহাসিক ভূমিকা, পূর্ব পাকিস্তানও তা স্বীকার করে থাকে। কাজেই পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তিনি চিরন্তন যোগসূত্র বলে গণ্য হচ্ছেন ও হবেন। তিনি প্রাক-বিভাগ বাংলার প্রতীক ও বাণীমূর্তিরূপে বেঁচে আছেন ও থাকবেন। দেশ বিভাগের কিছু পূর্বে নজরুলের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক জীবন সহসা স্তব্ধ হলো, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি দেশকে গ্রাস করলো। সে সময়ে নজরুল লোকের মনের কিছুটা পেছনে সরে গিয়েছিলেন। এমন একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে তাঁর কাছ থেকে যা পাওয়ার তা পাওয়া হয়ে গেছে, ভবিষ্যতের পক্ষেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের অন্তর্নিহিত যে সম্ভাবনা রয়েছে তা' তখন ঠিক লোকের দৃষ্টির সামনে ছিলনা। দেশ বিভাগের কিছু পরই কিন্তু দেশবাসী পুনরায় তাঁকে স্মরণ করলে। তারা উপলব্ধি করলে যে, যে সব মূল্যবোধ নজরুল অবিচলিতভাবে সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ডামাডোলে সে সব তলিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি। সেই হতে নজরুল সে সব শাশ্বত মূল্যবোধের আধার ও প্রচারকরূপে ক্রমেই অধিক প্রতিভাত হচ্ছেন। তাঁর জন্ম বার্ষিকী উৎসব এখন ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাঁর গান, ও আবৃত্তির জন্য তাঁর কবিতা উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা লাভ করছে। তাঁর নামে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্‌ছে, তাঁর জীবন ও সাহিত্য কীর্ত্তি সম্বন্ধে গবেষণামূলক বই ও প্রবন্ধ প্রকাশিত

হচ্ছে। নজরুল ও তাঁর আদর্শকে চিরকালের মতো বাঙ্গালীর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জনসাধারণের মধ্যে বিপুল আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পূর্ব পাকিস্তানীরা দেশ বিভাগ থেকে লাভবান হয়েছে বলে মনে করেন; সে কারণে নজরুলের আদর্শ রাজনৈতিক দিক দিয়ে সফল হয়নি বলে তাঁদের মনে বিশেষ দুঃখ নেই। কিন্তু তাঁর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গী তাঁরাও মেনে নিয়েছেন। কাজেই নজরুল সাহিত্যে যে সার্বজনীনতার উন্মুক্ত বিকাশ ঘটেছে তা তাঁদেরও শ্রদ্ধা ও অনুমোদন লাভ করেছে। গোঁড়া লোক অবশ্য অল্প কিছু আছেন যাঁরা নজরুলকে ভাল চোখে দেখেন না, কেননা তিনি ভারতীয় নাগরিক ও পাকিস্তানী ভাবধারা কখনও গ্রহণ করেননি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে নজরুলের অসীম জনপ্রিয়তা সে মুষ্টিমেয় লোকের আপত্তি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এ জন্যই আশা করা যায় যে নজরুল পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে স্থায়ী যোগ-সূত্ররূপেই বিরাজ করবেন। পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছেন; পশ্চিম পাকিস্তানও এখন এ' স্বীকৃতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে। এখন তাই মানুষের চিন্তায় ও স্মৃতিতে সামগ্রিক বাংলা সংস্কৃতির আধার ও আশ্রয়রূপে নজরুল শাশ্বত ও অম্লান সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। সেই সঙ্গে মিশেছে একান্ত অসময়ে তাঁর কর্মজীবনের অবসানে দেশবাসীর গভীর সশ্রদ্ধ বেদনা।

নজরুল ইসলামের জাতীয়তাবাদে কোনরূপ আপোষের অবকাশ ছিলনা, তিনি সামাজিক সুবিচারের পক্ষে অকুতো-ভয়ে দাঁড়িয়েছেন, সব রকম বিভেদ, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, প্রাণমাতানো গদ্যে, পদ্যে ও গানে

তিনি মানুষকে মানবিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে ডাক দিয়েছেন। তাঁর এই বহুমুখী বাণী এখন জনসাধারণের চেতনার অঙ্গীভূত। ১৯৬২ সালে যখন দেশ চীন কর্তৃক আক্রান্ত হয় তখন দেশবাসী জাতীয় স্বাধীনতা ও সম্মান রক্ষার্থে দাঁড়াবার জন্য তাঁরই বাণীতে সুনিশ্চিত প্রেরণা খুঁজে পায়। জাতীয় সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁর স্থায়ী অবদানের সংবাদ সারা ভারতেরই জনগণের গোচরে পৌঁচেছে। তাঁর কবিতা সব সময়েই লোককে প্রেরণা দেবে, অপূর্ব সুরমাধুর্যে ও ভাবগাম্ভীর্যে মণ্ডিত তাঁর গান সর্বকালে মানুষের কণ্ঠে গীত হবে। নজরুল ইসলামের কর্ম জীবন জীবনের নির্দিষ্ট পরিধির অংশমাত্রে সীমিত রয়েছে, তবু তাঁর সৃষ্টি জনসাধারণের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করছে, তাঁর প্রেরণা অব্যাহতভাবে সার্থক হয়ে চলেছে, ভবিষ্যদ্বংশীয়-দের জীবনে ও মনে তাঁর প্রভাব কার্যকরী থাকার সুনিশ্চিত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই আশা হয়, কালের দরবারে তাঁর স্থায়ী আসন লাভে কোনো সংশয় নেই। ভারতের জাতীয় জীবন ও ইতিহাসের পথে কাজী নজরুল ইসলামের যাত্রার শেষ নেই।

কাজী নজরুলের কয়েকটি নির্বাচিত কবিতা

বিদ্রোহী

বল বীর—

বল উন্নত মম শির

শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর

হিমাদ্রির !

বল বীর—

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'

চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'

ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,

খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া

উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর !

মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-

রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর !

বল বীর—

আমি চির-উন্নত শির ।

আমি চিরদুর্দ্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,

মহা- প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন,

আমি ধ্বংস,

আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর

আমি দুর্বার,

আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার !

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,

আমি দ'লে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম

কানুন শৃঙ্খল !

আমি মানিনাকো কোনো আইন,
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো,
আমি ভীম ভাসমান মাইন!
আমি ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড়
অকাল-বৈশাখীর!
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত
বিশ্ব-বিধাত্রীর!
বল বীর—
চির উন্নত মম শির!

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি'।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত
জীবনানন্দ
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চলচঞ্চল, ঠমকি, ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্!
আমি চপলা-চপল হিন্দোল।
আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!
আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার আমি উষ্ণ,
চির-অধীর।

বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির

আমি চির-দুরন্ত, দুর্ম্মদ,
আমি দুর্দ্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দ্দম্ হ্যায় হর্দ্দম্
ভরপুর্ মদ।
আমি হোম-শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়,
আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণি-সুত হাতে চাঁদ ভালে সূর্য্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী,
আর হাতে রণ-তূর্য্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া
ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি' বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর,
বল বীর—
চির উন্নত মম শির।

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল
ধর্ম্মরাজের দণ্ড,

আমি চক্র ও মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ
প্রচণ্ড

আমি ক্ষ্যাপা দুর্ব্বাসা-বিশ্বামিত্র শিষ্য,
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব !

আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস—আমি
সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলযের দ্বাদশ-রবির রাহু-গ্রাস !
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ
স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্প-হারী !
আমি প্রভঞ্জনের উচ্ছ্বাস, আমি বারিধির
মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল—ঊর্মির
হিন্দোল্-দোল্ !—

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে
বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি-সরসিজ প্রেম উদ্দাম,
আমি ধন্যি।
আমি উন্মন মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন শ্বাস, হা-হুতাশ
আমি হুতাশীর !
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা
যত পথিকের,

আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা
প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের !
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা,
ব্যথা সুনিবিড়
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম
পরশ কুমারীর !
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল-ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তা'র
কাঁকন-চুড়ির কন্-কন্
আমি চির-শিশু; চির-কিশোর,
আমি যৌবন-ভীতু পল্লীবালার আঁচর
কাঁচলি নিচোর।
আমি উত্তর-বায়ু, মলয়-অনিল, উদাস
পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু-বীনে
গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াষা, আমি
রৌদ্র রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি
শ্যামলিমা ছায়া-ছবি—
আমি তুরীয়ানন্দে ছুটে চলি এ কি উন্মাদ,
আমি উন্মাদ !
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ !

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে
চেতন
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ-মর্ত্ত্য করতলে,
তাজি বোররাক্ আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ-হ্রেষা হেঁকে চলে!
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি,
কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার-
কলরোল-কল-কোলাহল!
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া,
দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চরি' ভূমি-কম্প।
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি',
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুণের
পাখা সাপটি'!
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি
বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল!
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা সিন্ধু উতলা ঘুম্-ঘুম্
ঘুম্ চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিঝ্ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী

আমি রুষে উঠে, যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে
যায় কাঁপিয়া !
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া।

আমি শ্রাবণ-প্লাবন-বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু-জ্বালা, বিষধর কাল-ফনি !
আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিযা হাসি
পুষ্পের হাসি !

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয় !
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জ্জয়,
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ
স্বর্গ-পাতাল মর্ত্ত্য !
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !!
আমি চিনেছি আমারে, আজকে আমার
খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার !
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব
সৃষ্টির মহানন্দে !
মহা- বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে
বাতাসে ধ্বনিবে না—
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত !

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে
দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী
বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে
দেবো পদ চিহ্ন !
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !

আমি চির-বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা
চির-উন্নত শির ! (অগ্নি-বীণা)

কুলি-মজুর

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে—
চোখ ফেটে এল জল,
এমন ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্ব্বল !
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে—
বেতন দিয়াছ ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল !
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল্ ?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বল তো এ সব কাহাদের দান ? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ? ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইঁটে আছে লিখা।
তুমি জাননাক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে !

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু'পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !
তুমি শুয়ে রবে তে-তলার 'পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে !

সিক্ত যাদের সারা দেহ-মন মাটীর মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
তারি পদ-রজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি' যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি!
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত্ত পীড়িতের মাখি' খুন
লালে লাল হ'যে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ!
আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট ভাঙ্গিয়া দাও,
রং-করা ঐ চামড়ার মত আবরণ খুলে নাও!
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি করে ঢুকুক এ বুকে, খুলে দাও যত খিল!
সকল আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ুক আমাদের এই ঘরে,
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য্য তারারা পড়ুক ঝ'রে!
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি'
এক মোহানায় দাঁড়াইয়া শোনো এক মিলনের বাঁশী।
একজনে দিলে ব্যথা—
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা।
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা—সকলের অপমান!
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা-উত্থান,
উর্দ্ধে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান!

(সর্বহারা)

আমি গাই তারি গান

আমি গাই তারি গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরসান
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে।
লক্ষ যুগের প্রাচীন মমির পিরামিডে গেল লিখে
তাদের ভাঙ্গার ইতিহাস-লেখা। যাহাদের নিঃশ্বাসে
জীর্ণ পুঁথির শুষ্ক পাত্র উড়ে গেল এক পাশে।
যারা ভেঙ্গে চলে অপ-দেবতার মন্দির আস্তানা,
বক-ধার্ম্মিক নীতি-বৃদ্ধের সনাতন তাড়িখানা।
যাহাদের প্রাণ-স্রোতে ভেসে গেল পুরাতন জঞ্জাল,
সংস্কারের জগদল-শিলা, শাস্ত্রের কঙ্কাল।
মিথ্যা মোহের পূজা-মণ্ডপে যাহারা অকুতোভয়ে
এল নির্ম্মল—মোহ-মুদ্গর ভাঙ্গনের গদা ল'য়ে।
বিধি-নিষেধের চীনের প্রাচীরে অসীম দুঃসাহসে
দু'হাতে চালাল হাতুড়ি শাবল। গোরস্থানেরে চ'ষে
ছুঁড়ে ফেলে যত শব কঙ্কাল বসালো ফুলের মেলা,
যাহাদের ভিড়ে মুখর আজিকে জীবনের বালু-বেলা।
—গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।...

—সেদিন নিশীথ-বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,
প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশীথে জাগি'।
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে।

ফিরিল না প্রাতে যে-জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে
নব জগতের শর-সন্ধানী অসীমের পথ-চারী,
যার ভয়ে জাগে সদা সতর্ক মৃত্যু-দুয়ারে দ্বারী।

সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিগদিগন্ত জুড়ে
জীবনোদ্বেগে, তাড়া ক'রে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি, আনে যারা খুঁড়ি' পাতাল যক্ষপুরী ;
নাগিনীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হ'তে মণি চুরি।
হানিয়া বজ্র-পানির বজ্র উদ্ধত শিরে ধরি'
যাহারা চপলা মেঘ-কন্যারে করিয়াছে কিঙ্করী।
পবন যাদের ব্যজনী দুলায় হইয়া আজ্ঞাবাহী,—
এসেছি তাদের জানাতে প্রণাম, তাহাদের গান গাহি।
গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে!
যাহাদের কারাবাসে
অতীত রাতের বন্দিনী উষা ঘুম টুটি' ঐ হাসে!
(সন্ধ্যা)

সর্ব্বহারা

(১)

ব্যথার সাঁতার-পানি-ঘেরা
চোরাবালির চর,
ওরে পাগল! কে বেঁধেছিস
সেই চরে তোর ঘর?

শূন্যে তড়িৎ দেয় ইশারা,
হাট তুলে দে সর্ব্বহারা,
মেঘ-জননীর অশ্রুধারা
ঝর্‌ছে মাথার 'পর
দাঁড়িয়ে দূরে ডাক্‌ছে মাটী
দুলিয়ে তরু-কর॥

(২)

কন্যারা তোর বন্যাধারায়
কাঁদ্‌ছে উতরোল,
ডাক দিয়েছে তাদের আজি
সাগর-মায়ের কোল।
নায়ের মাঝি! নায়ের মাঝি!
পাল তুলে তুই দে রে আজি
তুরঙ্গ ঐ তুফান-তাজী
তরঙ্গে খায় দোল।
নায়ের মাঝি! আর কেন ভাই?
মায়ার নোঙর তোল!

(৩)

ভাঙ্গন-ভরা আগুনে তোর
যায় রে বেলা যায়।
মাঝি রে! দেখ্‌ কুরঙ্গী তোর
কূলের পানে চায়।
যায় চ'লে ঐ সাথের সাথী,
ঘনায় গহন শাঙন-রাতি,
মাদুর-ভরা কাঁদন পাতি
ঘুমুস্‌ নে আর হায়।

ঐ কাঁদনের বাঁধন ছেঁড়া
এতই কি রে দায় ?

(৪)

হীরা মাণিক চাস্‌নিক' তুই,
চাস্‌নি তো সাত ক্রোর,
একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র-
ভরা অভাব তোর।
চাইলি রে ঘুম শ্রান্তিহরা
একটি ছিন্ন মাতুর-ভরা,
একটি প্রদীপ-আলো-করা
একটু কুটীর-দোর।
আস্‌লো মৃত্যু আস্‌লো জরা,
আস্‌লো সিঁদেল-চোর॥

(৫)

মাঝি রে, তোর নাও ভাসিয়ে
মাটীর বুকে চল্।
শক্ত মাটীর ঘায়ে হউক
রক্ত পদতল।
প্রলয়-পথিক চল্‌বি ফিরি
দল্‌বি পাহাড় কানন গিরি !
হাঁকছে বাদল, ঘিরি' ঘিরি'
নাচ্‌ছে সিন্ধুজল।
চল্ রে জলের যাত্রী এবার
মাটীর বুকে চল্॥

(সর্ব্বহারা)

হিন্দু-মুসলিম-যুদ্ধ

মাভৈঃ ! মাভৈঃ, এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান !
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি' ব্যথা-জাগ্রত,
"খালেদ" আবার ধরিয়াছে আসি, অর্জ্জুন ছোড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান !

(২)

মরিছে হিন্দু, মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ-মরণে নাহি লাজ।
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।
আজি পরীক্ষা—কাহার দস্ত্ হয়েছে কত দারাজ !
কে মরিবে কাল সম্মুখ-রণে, মরিতে কা'রা নারাজ।

(৩)

মূর্চ্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল,
উঠিবে অমৃত, দেরী নাই আর উঠিয়াছে হলাহল।
থামিস্‌নে তোরা, চালা মন্থন !
উঠেছে কাফের, উঠেছে যবন ;
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু-মুসলিম মহাবল।
জেগেছিস তোরা. জেগেছে বিধাতা, নড়েছে খোদার কল

(৪)

আজি ওস্তাদে সাগ্‌রেদে যেন শক্তির পরিচয়।
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীরু ভারতেরে নির্ভয়।

হেরিতেছে কাল,—কব্‌জি কি মুঠি
ঈষৎ আঘাতে পড়ে কি-না টুটি'
মারিতে মারিতে কে হ'ল যোগ্য, কে করিবে রণ-জয়।
এ 'মক্‌-ফাইটে' কোন্ সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয়!

(৫)

ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ-কাঁথা।
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসী বকিছে প্রলাপ যা তা!
হায় এই সব দুর্বল-চেতা
হবে অনাগত বিপ্লব নেতা!
ঝড় সাইক্লোনে কি করিবে এরা? ঘূর্ণীতে ঘোরে মাথা?
রক্ত-সিন্ধু সাঁতরিবে কা'রা—করে পরীক্ষা ধাতা!

(৬)

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির মসজিদ,
পরাধীনদের কলুষিত ক'রে উঠেছিল যার ভিত!
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয়!
স্বাধীন হাতের পূত মাটী দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া? ওরে ঐ সাথে টুটেছে তোদের নিঁদ!

(৭)

কে কাহারে মারে, ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানে না আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার!
উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ;
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার!
ভারত-ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার!

(৮)

যে লাঠিতে আজ টুটে গুম্বজ, পড়ে মন্দিরচূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া !
প্রভাতে হবে না ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন !
করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিজয়-কেতন উড়া !
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়া !

(ফণি-মনসা)

ছাত্রদলের গান

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্চ্ছে তুফান,
ঊর্দ্ধে বিমান ঝড়-বাদল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে
যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙ্গাই
বিষম চলার ঘায় !
যুগে যুগে রক্তে মোদের
সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের কক্ষ্যচ্যুত-ধূমকেতু-প্রায়
লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর
নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে উঠেন
আমরা পশি নীল অতল,
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা ধরি মৃত্যু-রাজার
যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের
জীবন-ইতিহাস!
হাসির দেশে আমরা আনি
সর্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল॥

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়
আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব
আমরা ভাঙ্গি কূল।
দারুণ-রাতে আমরা তরুণ
রক্তে করি পথ পিছল।
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল,
বক্ষে ভরা বাক্,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক।

আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে
আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর।
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে
ভরেছি মা'র শ্যাম আঁচল।
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা রচি ভালোবাসার
আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাষ দেখায়
আকাশ-ছায়াপথ!
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর
স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

(সর্ব্বহারা)

চল্ চল্ চল্

কোরাস :—

চল্ চল্ চল্ !
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত,
বাধার বিন্ধ্যাচল ।

নব নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল ।

বল্ রে নৌ-জোয়ান,
শোন্ রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে-দুয়ারে
জীবনের আহ্বান ।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল,
চল্ রে চল্ রে চল্
চল্ চল্ চল্ ॥

কোরাস ঃ—

উর্দ্ধে আদেশ হানিছে বাজ,
শহীদী ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচকাওয়াজ
খোল রে নিঁদ্-মহল !

কবে সে খোয়ালী বাদ্শাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্ অশ্রুজল ।

যাক্ রে তখ্ত্-তাউস
জাগ্ রে জাগ্ বেহুঁস !

ডুবিল রে দেখ্ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুষ,
জাগিল তারা সকল,
জেগে ওঠ্ হীনবল !
আমরা গড়িব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল !
চল্ চল্ চল্ ॥

কোরাস ঃ-

(সন্ধ্যা)

আমার কৈফিয়ৎ

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবি,'
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুঁজে তাই সই সবি!
কেহ বলে 'তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে বাণী
কই, কবি?'
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী।

(২)

কবি-বন্ধুরা হতাশ হইয়া মোর লেখা প'ড়ে
শ্বাস ফেলে।
বলে, কেজো ক্রমে হচ্ছে অকেজো পলিটিক্সের
পাঁশ ঠেলে।
পড়েনাক' বই, ব'য়ে গেছে ওটা।
কেহ বলে, বৌ-এ গিলিয়াছে গোটা।
কেহ বলে, মাটী হ'ল হ'য়ে মোটা জেলে ব'সে
শুধু তাস খেলে।
কেহ বলে, তুই জেলে ছিলি ভালো,
ফের যেন তুই যা'স জেলে।

(২)

গুরু ক'ন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে
দাড়ি চাঁচা।
প্রতি শনিবারই চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন,
'তুমি হাঁড়িচাঁচা!'
আমি বলি, 'প্রিয়ে, হাটে ভাঙি হাঁড়ি—'
অম্‌নি বন্ধ চিঠি তাড়াতাড়ি।

সব ছেড়ে দিয়ে করিলাম বিয়ে, হিন্দুরা ক'ন,
আড়ি চাচা
যবন না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি
দাড়ি, নাড়ি' কাছা।'

(৪)

মৌ-লোভী যত মৌলবী আর 'মোল-লারা'
ক'ন হাত নেড়ে,
'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও
পাজিটার জাত মেরে।
ফতোয়া দিলাম—কাফের কাজী ও,
যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!
'আমপারা' পড়া হাম্-বড়া মোরা এখনো
বেড়াই ভাত মেরে।'
হিন্দুরা ভাবে, 'ফার্শী-শব্দে কবিতা লেখে ও
পা'ত-নেড়ে।'

(৫)

আন্‌কোরা যত নন্‌ভায়োলেণ্ট নন্-কো'র
দলও নন্ খুশী।
'ভায়োলেন্সের ভায়োলিন্' নাকি আমি,
বিপ্লবী-মন তুষি!
'এটা অহিংস' বিপ্লবী ভাবে,
'নয় চরকার গান কেন গা'বে?'
গোঁড়া-রাম ভাবে নাস্তিক আমি, পাতি-রাম ভাবে
কন্‌ফুসি।
স্বরাজীরা ভাবে নারাজী, নারাজীরা ভাবে
তাহাদের অঙ্কুশি'।

(৬)

নর ভাবে, আমি বড় নারী-ঘেঁষা ! নারী ভাবে,
নারী-বিদ্বেষী ।
'বিলেত ফেরনি ?' প্রবাসী-বন্ধু ক'ন,
'এই তব বিদ্যে, ছি !'
ভক্তরা বলে, 'নবযুগ-রবি' !—
যুগের না হই, হুজুগের কবি
বটি তো রে দাদা, আমি মনে ভাবি আর
ক'ষে কষি হৃদ-পেশী
দু-কানে চশ্‌মা আঁটিয়া ঘুমানু,
দিব্যি হ'তেছে নিদ্ বেশী !

(৭)

কি যে লিখি ছাই মাথা ও মুণ্ডু, আমিই কি বুঝি
তার কিছু ?
হাত উঁচু আর হ'ল না তো ভাই, তাই লিখি
ক'রে ঘাড় নীচু ।
বন্ধু ! তোমরা দিলেনাক' দান,
রাজ-সরকার রেখেছেন মান !
যাহা কিছু লিখি অমূল্যে ব'লে অ-মূল্যে নেন ।
আর কিছু
শুনেছ কি, হুঁ হুঁ, ফিরিছে রাজার প্রহরী সদাই
কার পিছু ?

(৮)

বন্ধু ! তুমি তো দেখেছ আমায় আমার মনের
মন্দিরে,

হাড় কালি হ'ল, শাসাতে নারিনু তবু পোড়া
মন-বন্দীরে !
যতবার বাঁধি ছেঁড়ে সে শিকল,
মেরে মেরে তারে করিনু বিকল,
তবু যদি কথা শোনে সে পাগল ! মানিল না
রবি-গান্ধীরে ।
হঠাৎ জাগিয়া বাঘ খুঁজে ফেরে নেশার
আঁধারে বন চিরে !

(৯)

আমি বলি, ওরে কথা শোন্ ক্ষ্যাপা, দিব্যি আছিস্
খোশ্ হালে !
প্রায় 'হাফ'-নেতা হ'য়ে উঠেছিস, এবার এ দাঁও
ফস্কালে,
'ফুল'-নেতা আর হবিনে যে হায় !—
বক্তৃতা দিয়া কাঁদিতে সভায়
গুঁড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা !
সেই তালে
নিস্ তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি
শেষকালে !

(১০)

বোঝেনাক' যে সে চারণের বেশে ফেরে দেশে দেশে
গান গেয়ে,
গান শুনে, সবে ভাবে, ভাবনা কি ! দিন যাবে
এবে পান খেয়ে ।
রবেনাক' ম্যালেরিয়া মহামারী,
স্বরাজ আসিছে চ'ড়ে জুড়ি-গাড়ী,

চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়,
কাঁদে ছেলে-মেয়ে।
মাতা কয়, ওরে চুপ্‌ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে,
দেখ্‌ চেয়ে!

(১১)

ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত,
একটু নুন।
বেলা ব'য়ে যায়, খায়নিক' বাছা, কচি পেটে তার
জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়!
কেঁদে বলি· ওগো ভগবান, তুমি আজিও আছ কি?
কালি ও চুণ
কেন ওঠেনাক' তাহাদের গালে, যারা খায় এই
শিশুর খুন?

(১২)

আমরা তো জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্ত্তাকু
এনেছি খাস!
কত শত কোটী ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙ্গাড়িয়া
কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ!
টাকা দিতে নারে ভুখারী সমাজ।
মা'র বুক হ'তে ছেলে কেড়ে খায়, মোরা বলি,
বাঘ, খাও হে ঘাস!
হেরিনু, জননী মাগিছে ভিক্ষা ঢেকে রেখে
ঘরে ছেলের লাশ!

(১৩)

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষ-জ্বালা
এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে
কই মুখে,
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা,
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক' মাথায়,
বন্ধু, বড় দুঃখে !
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু,
যাহারা আছ সুখে !

(১৪)

পরোয়া করি না, বাঁচি বা না বাঁচি
যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপরে জ্বলিছেন রবি, রয়েছে
সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা ক'রো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ
কোটী মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায়
তাদের সর্বনাশ !

(সর্বহারা)

অন্ধ স্বদেশ-দেবতা

ফাঁসির রশ্মি ধরি'
আসিছে অন্ধ স্বদেশ-দেবতা, পলে পলে অনুসরি'
মৃত্যু-গহন-যাত্রীদলের লাল পদাঙ্ক-রেখা।
যুগযুগান্ত-নির্জিত-ভালে নীল কলঙ্ক-লেখা!

নিরন্ধ্র মেঘে অন্ধ আকাশ, অন্ধ তিমির রাতি,
কুহেলি-অন্ধ দিগন্তিকার হস্তে নিভেছে বাতি,
চলে পথহারা অন্ধ দেবতা ধীরে ধীরে এরি মাঝে,
সেই পথে ফেলে চরণ—যে-পথে কঙ্কাল পায়ে বাজে!

নির্য্যাতনের যষ্টি দিযা শত্রু আঘাত হানে,
সেই যষ্টিরে দোসর করিযা অলক্ষ্য পথ-পানে
চলেছে দেবতা—অন্ধ দেবতা—পায়ে পায়ে পলে পলে,
যত ঘিরে আসে পথ-সঙ্কট চলে তত নব-বলে।

ঢ'লে পড়ে পথ' পরে,
নবীন মৃত্যু-যাত্রী আসিয়া তুলে ধরে বুকে ক'রে!

অন্ধ কারার বন্ধ দুয়ারে যথায বন্দী জাগে,
যথায় বধ্য-মঞ্চ নিত্য রাঙিছে রক্ত-রাগে,
যথায পিষ্ট হ'তেছে আত্মা নিষ্ঠুর মুঠি-তলে,
যথায় অন্ধ গুহায় ফনীর মাথায় মানিক জ্বলে,
যথায বন্য শ্বাপদের সাথে নখর দন্ত ল'য়ে
জাগে বিনিদ্র বন্য-তরুণ ক্ষুধার তাড়না স'য়ে,
যথা প্রাণ দেয় বলির নারীরা যূপকাষ্ঠের ফাঁদে,—
সেই পথে চলে অন্ধ দেবতা, পথ চলে আর কাঁদে,
"ওরে ওঠ, ত্বরা করি'
তোদের রক্তে—রাঙ্গা উষা আসে, পোহাইছে বিভাবরী!"

তিমির রাত্রি, ছুটেছে যাত্রী নিরুদ্দেশের ডাকে,
জানে না কোথায় কোন্ পথে কোন্ ঊর্ধে দেবতা হাঁকে !
শুনিযাছে ডাক এই শুধু জানে ! আপনার অনুরাগে
মাতিয়া উঠেছে অলস চরণ, সম্মুখে পথ জাগে !
জাগে পথ, জাগে ঊর্ধে দেবতা, এই দেখিয়াছে শুধু,
কে দেখে সে পথে চোরা বালুচর, পর্ব্বত, মরু ধূ ধূ !
ছুটেছে পথিক, সাথে চলে পথ, অমানিশি চলে সাথে,
পথে পড়ে ঢ'লে, মৃত্যুর ছলে ধরে দেবতার হাতে।
চলিতেছে পাশাপাশি—
মৃত্যু, তরুণ, অন্ধ দেবতা, নবীন ঊষার হাসি !

(সন্ধ্যা)

চক্রবাক

এপার ওপার জুড়িয়া অন্ধকার
মধ্যে অকূল রহস্য-পারাবার,
তারি এই কূলে নিশি নিশি কাঁদে জাগি
চক্রবাক সে চক্রবাকীর লাগি।
ভু'লে-যাওয়া কোন্ জন্মান্তর পারে
কোন সুখ-দিনে এই সে নদীর ধারে
পেয়েছিল তারে সারা দিবসের সাথী,
তারপর এল বিরহের চির-রাত্রি,—
আজিও তাহার বুকের কথার কাছে
সেই সে স্মৃতির পালক পড়িয়া আছে !

কেটে গেল দিন, রাত্রি কাটেনা আর,
দেখা নাহি যায় অতিদূর ঐ পার।
এপারে ওপারে জনম জনম বাধা,
অকূলে চাহিয়া কাঁদিছে কূলের রাধা।
এই বিরহের বিপুল শূন্য ভরি'
কাঁদিছে বাঁশরী সুরের ছলনা করি।
আমরা শুনাই সেই বাঁশরীর সুর,
কাঁদি সাথে কাঁদে নিখিল ব্যথা-বিধুর।
কত তের নদী সাত সমুদ্র পার
কোন্ লোকে কোন্ দেশে গ্রহ তারকার
সৃজন দিনের প্রিয়া কাঁদে বন্দিনী,
দশ দিশি ঘিরি' নিষেধের নিশীথিনী।
এপারে বৃথাই বিস্মরণের কূলে
খোঁজে সাথী তার, কেবলি সে পথ ভুলে।
কত পায় বুকে কত সে হারায় তবু
পায়নি যাহারে ভোলেনি তাহারে কভু।
তাহারি লাগিয়া শত সুরে শত গানে
কাব্যে, কথায়, চিত্রে, জড় পাষাণে,
লিখিছে তাহার অমর অশ্রু-লেখা।
নিরন্ধ্র মেঘ বাদলে ডাকিছে কেকা!
আমাদের পটে তাহারি প্রতিচ্ছবি,
সে গান শুনাই—আমরা শিল্পী কবি।
এই বেদনার নিশীথ-তমসা-তীরে
বিরহী চক্রবাক খুঁজে খুঁজে ফিরে
কোথা প্রভাতের সূর্যোদয়ের সাথে
ডাকে সাথী তার মিলনের মোহানাতে।

আমরা শিশির, আমাদের আঁখি-জলে
সেই যে আশার রাঙ্গা রামধনু ঝলে !
(চক্রবাক)

কাণ্ডারী হুশিয়ার !

কোরাস্ ঃ—

দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার !

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার ॥

(২)

তিমিররাত্রি, মাতৃমন্ত্রী সান্ত্রীরা, সাবধান !
যুগযুগান্তসঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া উঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার ॥

(৩)

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী ! আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ !
"হিন্দু না ওরা মুসলিম ?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গর্‌জায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যজিবে কি
পথ মাঝ?
ক'রে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার॥

(৫)

কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙ্গালীর খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর!
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পূনর্ব্বার।

(৬)

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী, হুশিয়ার॥

(সর্বহারা)

সাম্যবাদী

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!

কে তুমি ?—পার্সী ? জৈন ? ইহুদী ? সাঁওতাল
ভীল, গারো ?
কনফুসিয়াস্ ? চার্ব্বাক-চেলা ? ব'লে যাও, বলো
আরো !
বন্ধু, যা খুশি হও,
পেটে পিঠে কাঁধে মগজে যা-খুশি পুঁথি
ও কেতাব বও,
কোরাণ-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক-
জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব প'ড়ে যাও, যত সখ,—
কিন্তু, কেন এ পণ্ডশ্রম, মগজে হানিছ শূল ?
দোকানে কেন এ দর-কষাকষি ?—পথে ফুটে
তাজা ফুল !
তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের
জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেখ
নিজ প্রাণ !
তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম, সকল যুগাবতার,
তোমার হৃদয় বিশ্ব-দেউল সকলের দেবতার।
কেন খুঁজে ফের' দেবতা ঠাকুর মৃত পুঁথি কঙ্কালে ?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।

বন্ধু, বলিনি ঝুট্,
এইখানে এসে লুটাইয়া পড়ে সকল রাজমুকুট।
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন,
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম্ এ, মদিনা, কাবা-ভবন,

মস্‌জিদ এই, মন্দির এই, গির্জ্জা এই হৃদয়,
এইখানে ব'সে ঈশা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।
এই রণ-ভূমে বাঁশীর কিশোর গাহিলেন মহা-গীতা,
এই মাঠে হ'ল মেষের রাখাল নবীরা
খোদার মিতা।
এই হৃদয়ের ধ্যান-গুহা-মাঝে বসিয়া শাক্যমুনি
ত্যজিল রাজ্য মানবের মহা-বেদনার
ডাক শুনি'।
এই কন্দরে আরব-দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরাণের
সাম-গান
মিথ্যা শুনিনি ভাই!
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।

(সর্ব্বহারা)

গান

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরী।
চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছল ছল জল-লহরী॥

দিবা চ'লে যায় বলাকা-পাখায়
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়!
কেঁদে চখা-চখী মাগিছে বিদায়
বারোয়াঁর সুরে ঝুরে বাঁশরী॥

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ-সিঁথি রচি' চিকুরে,
নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে,
দুলে লটপট লতা-কবরী ॥

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী,
'চলো জল নিতে যাবি লো যদি'
কালো হয়ে আসে সুদূর নদী,
নাগরিকা সাজে সাজে নগরী ॥

মাঝি বাঁধে তরী সিনান-ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে
কারে ভেবে বেলা কাঁদিযা কাটে
ভর আঁখি জলে ঘট গাগরী ॥

ওগো বে-দরদী, ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে,
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তারে না গলে পারি ॥

(বুলবুল)

সখি, বলো বধূয়ারে নিরজনে।
দেখা হ'লে ফুলবনে ॥
কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালী,
কে দেয় গহীর রাতে ফুলের কুলে কালি
জেনেছে কুলমালী গোপনে।

কাঁটার আড়ালে গোলাপের বাগে
ফুটায়েছে কুসুম কপট সোহাগে,
সে কুসুম ঘেরা মেহেদীর বেড়া,
প্রহরী ভোমরা সে কাননে ॥

ও পথে চোরকাঁটা, সখি, তায় ব'লে দিও,
বেঁধেনা বেঁধেনা লো যেন তার উত্তরীর !
এ বনফুল লাগি না আসে কাঁটা দলি
আপনি যাব আমি বঁধয়ার কুঞ্জ গলি'
বকাব বিনিমূলে ও চরণে

(বুলবুল)

কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি ॥

সে থাকে নীল নভে আসি নয়ন-জল-সায়রে,
সাতাশ তারার সতীন-সাথে সে যে ঘুরে মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে রাহু নহি ॥

কাজল করি যারে রাখিগো আঁখি-পাতে
স্বপনে যায় সে ধুয়ে গোপন অশ্রু-সাথে।
বুকে তায় মালা করি' রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি,
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি' ॥

(